প্রীতির বন্ধন

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

৩৪সি, আমহার্স্ট রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীমণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৩৪সি, আমহার্স্ট রো
কলিকাতা-৯

রবীন্দ্র জয়ন্তী, ১৩৭১

মুদ্রাকর :
শ্রীচন্দ্রশেখর দে
শ্রীকমলা প্রেস
২৭সি, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রীতির বন্ধন

লেখকের অন্যান্য বই

চিতাবহ্নিমান

সন্ধ্যারাগ

মুকুট মাল্য

বরবধূ

মিলন শঙ্খ

॥ এক ॥

সেদিন দোলযাত্রা !

উৎসবের দিন। গ্রামের সকলে খোলকরতাল নিয়ে শোভাযাত্রা করে আসছে। হোলি খেলছে তারা—তারই শব্দ আর গান ভেসে আসছে কানে।

অনিমেষ তাদের ভাঙা বাড়ীর বারান্দায় বসে বসে শুনছিল ঐ গান—

"আজ হোলি খেলবো শ্যাম তোমারই সনে,
একলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে—"

অনিমেষ জন্মান্ধ। ঠিক জন্মান্ধ বলাও চলে না—জন্মগত অন্ধ—মার কাছে শুনেছে—তার দু'বছর বয়সের সময় চোখে কি একটা অসুখ হয়ে চোখ নষ্ট হয়ে যায়—চোখের মণি দুটো নেই তার। এ ছাড়া অনিমেষ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছেলে—বয়স প্রায় ষোল। কিন্তু চোখ যার নেই তার কিছুই নেই—সে সর্ব্বহারা—অনিমেষ তাই ভাবে।

দোললীলার গান ভেসে আসছে কানে। শোভাযাত্রাটা এসে পড়বে—অতসীও আসবে নাকি ঐ শোভাযাত্রার সঙ্গে ! নাঃ সে নিশ্চয় আসবে না। কিন্তু আসতেও তো পারে। কে জানে। ভাবছে অনিমেষ—কার যেন পদশব্দ—কে যেন আবির দিল অনিমেষের কপালে—ঠিক বুঝতে পারলো না।

—কে ?

—আমি রে।

—ও, মলয় ! কী খবর ?

—খবর জবর—অতসী সেই যে মামার বাড়ী গেছে আজও আসবার নামটি নেই।

—তাই নাকি! আমি তো জানতাম না।

—জানবি কি করে! হঠাৎ নাকি তার মামাতো বোনের বিয়ে—তাই গেছে।

—ওঃ।

হতাশ হোল অনিমেষ কিন্তু আর কিছু বললো না। মলয় বললো,

—যাত্রাগান হবে—যাবি শুনতে?

—যাব—কোথাকার যাত্রা?

—কোলকাতার। টিকিট করে যাত্রা হবে—আট আনা—এক টাকা—দু'টাকার টিকিট।

—তবে কি করে যাব? আমার তো পয়সা নেই!

—তোর জন্য আমি একখানা টিকিট কিনে আনবো। আট আনার দুটো কিনবো—একটা টাকা আছে আমার। যাবি তো?

—হ্যাঁ যাব—তুই আমাকে নিয়ে যাবি?

—রাত আটটায় যাত্রা জুড়বে। খেয়ে রেডি থাকিস।

মলয় চলে গেল। অনিমেষ ভাবছে। ভাবছে যাত্রা সে শুনতে যাবে। দেখতে পাবে না—তবু শুনবে—কে জানে কি শুনবে, কেমন শুনবে।

অনিমেষের মত করুণ জীবন কম ছেলেরই হয়। বনেদী ভাঙা পরিবারে জন্ম—দু'বছর বয়সে অন্ধ হয়েছে—সাত বছর বয়সে মা মারা যায়। বাবা আবার বিয়ে করেছেন—সৎমা—তার দুটি ছেলেমেয়ে—অনিমেষ নিতান্ত সৎ ছেলে। বাইরের দিকে একটা কুঠরীতে একা থাকে অনিমেষ—সকালে এক মুঠি মুড়ি আর দুপুরে এক থালা ভাত ওকে দিয়ে যায়—ঝি সুভদ্রা। সুভদ্রা পুরনো ঝি—তাই অনিমেষকে

একটু স্নেহ-যত্ন করে। এ ছাড়া অনিমেষের আর কেউ কোথাও নেই। না—ঠিক তা নয়—ভৎর্সনা করতে গঞ্জনা দিতে বাবা তো আছেনই—সংমাও কম যান না। অলক্ষুণে-অপেয়ে শব্দ হরদম কানে আসে। কাজ তার কিছুই নেই খায় আর বসে বসে পাড়ার ছেলেমেয়েদিকে নিয়ে গল্প করে—একটা একতারা যোগাড় করেছে সেইটা বাজায় আর গান গায়। গান গাইতে শিখিয়েছে গাঁয়ের নফরদাস বৈরাগী। বাউল গান—নফর সেই গান গাইতে গাইতে ভিক্ষা করে—একদিন অনিমেষ তাকে বলেছিল—

—আমাকে দু'একটা গান শিখিয়ে দাও না নফরদা!

—আচ্ছা শেখ—

নফর মাঝে মাঝে আসে—গান শেখায়—ঐ একতারাটা সেই দিয়েছে। এটাকে ভাল চোখে দেখেনা ওর বাবা বা সংমা – কিন্তু করে কি! বেশী কিছু বললে – অন্ধ চোখ ফেটে জল গড়াবে। আর পাড়ার লোকে বলবে—কানা ছেলেটার উপর কি অত্যাচারই না চালাচ্ছে!

অনিমেষকে সকলেই বলে সুন্দর। অনিমেষ নিজে জানে না – সে সুন্দর কি না? পৃথিবীর কিছুই সে দেখেনি। শুধু শুনেছে – এখানে সুন্দর আছে – কুৎসিৎ আছে – ফুল আছে – ফল আছে – মানুষ আছে – পশুপাখী আছে – ঘরবাড়ী আছে—আবার নাকি নদী – বন – পাহাড়ও আছে। আপন কল্পনায় সেই সবের সম্ভাব্য রূপ গড়ে তোলে অনিমেষ। আজ তাই করছে যাত্রা সম্বন্ধে। যাত্রায় গান হয় – গান খুব ভালবাসে অনিমেষ। বাউল গান তো শিখেছে কয়েকটা। বাজাতেও পারে ভাল। খোলমন্দিরা নিয়ে শোভাযাত্রা ওদের বাড়ীর সামনের পথ দিয়ে এল। তার সঙ্গে এলো সুধীর – সুনীল – অরুণা – বরুণা – শেফালী – অঞ্জলী – ওরা সবাই আবির দিল অনিমেষকে। আহা! অন্ধ বন্ধু তাদের—তারা সকলেই এলো—বললো,

—যাত্রা শুনতে যাবি তো অনি !

—হ্যাঁ—যাব—নলয় নিয়ে যাবে—আট আনার টিকিট।

—বেশ—বেশ—আমরাও আট আনার টিকিটে যাব।

ওরা সব চলে গেল।

সবশেষে এল জয়শ্রী। ওপাড়ার মেয়ে। ধনী কন্যা। ওর বাবা ঠিকাদারী করে কিছু টাকা করেছেন। বাড়ী-গাড়ীও করেছেন। জয়শ্রী তাঁর দুলালী কন্যা। বয়স বারো বছর—ঝির সঙ্গে দোলের শোভাযাত্রা দেখে বেড়াচ্ছে। অনিমেষকে দেখলো—একেবারে কাছে এসে বললো,

—তুমি দেখতে পাও না ?

—না—তুমি কে ?

—আমি জয়শ্রী—জয়া বলে আমাকে। তোমাকে আবির দেব ?

—দাও—আমিও কিন্তু দেব তোমাকে ?

—দাওনা—দাও—এই নাও আবির।

জয়া খানিকটা আবির দিল অনিমেষের হাতে। কোনদিন তাকে দেখেনি অনিমেষ—কোনো পরিচয় নেই ওর সঙ্গে তবুও দিল আবির। অনিমেষও দিল। জয়া বলল,

—তোমাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাব। যাবে ?

—হ্যাঁ—কখন নিয়ে যাবে ?

—কাল। মাকে বলে তোমাকে নিয়ে যাব।

—আচ্ছা—আমি যাব।

—তোমার ওটা কি ? একতারা ? বাজাও তো শুনি—গাইতে পার ?

—হ্যাঁ—শোনো।

অনিমেষ তৎক্ষণাৎ আরম্ভ করে দিল গান। জয়া শুনলো।

ওর ঝি তাগাদা দিচ্ছে যাবার জন্য। জয়া তাকে ধমক দিয়ে বলল —যাব না—গান শুনবো। গাও আর একটা।

অনিমেষ গাইল। জয়া শুনে বললো,

—বাঃ! খুব সুন্দর।

গানও নাকি সুন্দর হয়! জানতো না অনিমেষ। জয়া কিন্তু চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—কাল সে এসে নিয়ে যাবে অনিমেষকে।

অনিমেষের হাত ধরে আদর করে বলে গেল,

—আসবো—আসবো—আসবো।

এদিকে অনিমেষের জন্য আনা ভাতের থালাটায় পিড়ছে ধরেছে। কয়েকটা কামড়ালো অনিমেষকে। এ তার নিত্যকার ব্যাপার—তাই গ্রাহ্য করলো না—খেয়ে নিল। হাতড়ে হাতড়ে সব কাজ করতে হয়। তাই হাতের কাছেই সব—দরকারি বস্তু রাখে অনিমেষ। একতারাটা নিয়ে দোলের শোভাযাত্রায় শোনা গানটা গাইতে লাগলো। এইটুকু ছাড়া তার জীবনে আর কোনো আনন্দ নেই। গানও তো সে ভাল করে শিখতে পারছে না। তার গান নাকি সুন্দর—ঐ জয়শ্রী বলে গেছে।

গান সুন্দর—যে বলেছে—সে কেমন সুন্দর? দেখতে পেল না অনিমেষ।

সারাদিন ঐ কথাটাই ভাবছে—ঐ জয়শ্রীর কথা। কথাগুলো খুবই মিষ্টি—খুব সুন্দর। হ্যাঁ কথাও তো সুন্দর হয়। এমন সুন্দর করে কেউ তো কথা বলেনি। অনেকেই আসে—তারা সবাই কৃপার চোখে চায়—জয়া এল মমতা নিয়ে—এমন আর কেউ আসে নি। অতসী তো দারুণ অহঙ্কারী মেয়ে। শুধু মাষ্টারই যা একটু ভালবাসে অনিমেষকে। আর এই জয়া—কে জানে জয়াকে তো আজই প্রথম দেখলো—না না—দেখলো কোথায়? শুনলো তার নাম—তার কণ্ঠস্বর। কিন্তু কী মিষ্টি কণ্ঠস্বর! গান শিখলে খুব ভাল গাইতে পারবে।

কখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঝি একটা লম্ফ নিয়ে এলো—বললো,

—এই নে—অনু—খেয়ে নে।

—দাও।

খেল চার-পাঁচ শুকনো রুটি আর একটু ঝোল আর—একটু গুড় মাত্র। তাই খেল অনিমেষ—জল খেল। ঝি চলে গেল থালাবাটি নিয়ে—লম্ফটাও।

অনিমেষের কি বা রাত্রি কি বা দিন। কি বা আলো কি বা অন্ধকার। কিন্তু তবু আলো থাকলে কেমন বুঝতে পারে অনু—না থাকলে বড্ড কেমন অসহায় বোধ হয়। তবে অভ্যাস হয়ে গেছে। তাই চলে যাচ্ছে তার।

—অনি!

মলয় ডাকলো। সে যথাসময়ে এসেছে। অনিমেষ বললো—আয়।

—চল—টিকিট কিনেছি চল—জামাটা গায়ে দে।

—ভেতরে মাকে বলে আয়।

—আচ্ছা।

মলয় বলে এল। জামাটা পড়তে সাহায্য করলো অনিমেষকে; তারপর হাত ধরে নিয়ে গেল যাত্রা শুনতে। সেখানে বিস্তর গোলমাল—মলয় ওকে নিয়ে গিয়ে বসাল নিজেও বসলো। যাত্রার ঐক্যতান বাজছে। শুনছে অনিমেষ কী সুন্দর বাজনা—কী মিষ্টি আওয়াজ। যাত্রা আরম্ভ হোল—নাটকটা মহাভারতের—অভিমন্যু বধ—

কী করুণ—কী মর্ম্মান্তিক গল্প! অনিমেষ শুনে বিহ্বল হয়ে পড়ল।

ওর চোখে জল গড়াচ্ছে। মলয় বললো,

—কাঁদিস নে এ তো সত্যি নয়—শুধু গল্প!

—তা হোক—তবু কান্না পাচ্ছে। কাল আবার হবে রে?

—হ্যাঁ—কাল অন্য পালা হবে। শুনবি?

—আর পয়সা কোথায়?

—দেব। কালও তোর জন্য টিকিট করবো আমি।

—তাহলে শুনবো। সবাই উঠে গেছে—মলয় ফিরছে অনিমেষকে নিয়ে।

॥ দুই ॥

পথ নির্জন—রাত প্রায় দুটো—সকলেই চলে গেছে। শুধু যাত্রা-দলের যায়গাটায় আলো জ্বলছে। ওরা হয়তো এখনো শোয়নি—মলয় বলল—অনিমেষকে—কেমন শুনলি অনি ?

—ভাল—খুব ভাল। তুই কেমন দেখলি বল ?

—ভালই। তবে অভিমন্যুর চেহারা ভাল নয়—তোকে সাজালে ভাল মানাত।

—আমাকে ? আমি যে অন্ধ রে !

—তা হোক, তোর যা সুন্দর চেহারা, আর যা মিষ্টি গলা—একটা গান করতো অনি···

—আচ্ছা—বলে অনিমেষ আরম্ভ করলো,

"দোলেতে আওয়ে মেরা মেইয়া কানাইয়া বেণু
আওয়ে কানাইয়া—আওয়ে কানাইয়া
আওয়ে কানাইয়া হো, আওয়ে কানাইয়া বেনু···"

আকাশ আচ্ছন্ন করে যেন সুধা ঝরছে, এমনি মিষ্টি গলা অনিমেষের। নির্জন গ্রাম পথ—আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ—বাতাসে বসন্তের সুবাস—মধ্যরাত্রির মাদকতা—সব মিলিয়ে যেন একটা স্বর্গ-সুষমা গড়ে তুলেছে। আশ্চর্য্য তো !

—কে গাইছে—কে ?

প্রশ্নটা করতে করতে এগিয়ে এলেন ঐ যাত্রাদলের অধিকারী।

মলয় আর অনিমেষ দাঁড়িয়ে গেল। অধিকারী আবার শুধোলেন,

—কি নাম তোমার, কোথায় বাড়ী ? কার ছেলে তুমি ?

—আমার নাম অনিমেষ, বাড়ী এই গাঁয়েই—বাবার নাম শ্রীঅসিত ঘোষাল।

—সুন্দর গলা তো তোমার ! পড়াশুনো কর ?

—না স্যার।

—না। কেন ? গাঁয়েই তো ভাল স্কুল রয়েছে।

—আমি অন্ধ স্যার।

—অন্ধ ? দেখি ।

অধিকারী অত্যন্ত কাছে এসে দেখলেন অনিমেষকে। দেখে বললেন,

—এমন সুন্দর চেহারা—অন্ধ। আহা!—কথাটা বলেই অন্ধ ভেবে আবার বললেন,

—তোমার বাবা কোথায় ? তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—তিনি বাড়ীতেই থাকেন।

—আমি সকালে যাব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কোনদিকে বাড়ী তোমাদের ?

—যাবেন ? ঐ সে ভাঙামত চিলেকোঠা—ঐটা। ঘোষাল বাড়ী বললেই সবাই দেখিয়ে দেবে—এ কথাটা বললো।

—আচ্ছা—যাও এখন—শোওগে।

পরদিন সকালেই ঘোষালদের পুরাতন বৈঠকখানার দরজায় এসে যাত্রাদলের ম্যানেজার শ্রীরমেশ অধিকারী দাঁড়ালেন। গৃহস্বামী অসিত ঘোষাল করজোড়ে অভ্যর্থনা করে ভেতরে বসালেন তাঁকে। অধিকারী মশাই বললেন,

—কাল রাত্রে আপনার ছেলে অনিমেষকে দেখলাম—ছেলেটি অন্ধ। ওর ভবিষ্যৎ জীবনও তো অন্ধকার। ওর সম্বন্ধে কি আপনি করবেন ভেবেছেন ?

—কি আর করবো। অন্ধ স্কুলে পড়াবার মত কোনো সম্বল আমার নেই। ছাপোষা মানুষ, জমিদারি, জমি সবই গেছে—আর উপায় প্রায় কিছুই নেই। কোনোরকমে দিন চলে।

—ছেলেটিকে দিন আমায়। আমি ওকে শিখিয়ে নেব আমার যাত্রাদলের জন্য—গান আর অভিনয় দুটোই। অবশ্য তার জন্য আমাকে যথেষ্ট খাটতে হবে, খরচও করতে হবে, তা হোক আখেরে ও ভাল রোজগার করতে পারবে।

—আপনি কোথায় নিয়ে যেতে চান তাকে?

—আপাততঃ আমাদের দলে ঘুরবে—বৈশাখ মাস নাগাদ আমরা যাব কোলকাতায় ফিরে। তখন যাবে আমার বাড়ীতে, থাকবে—খাবে—শিখবে।

—তাইতো! অন্ধছেলে—ঘোষালমশাই আমতা আমতা করছেন।

—শুনুন—এখানে এভাবে পড়ে থাকলে ওর জীবনটাই মাটি হয়ে যাবে। আপনি তো আর চিরদিন বেঁচে থাকবেন না। তার চেয়ে আমাকে দিন, ওর রোজগারের পথ আমি খুলে দেব!

—তাই তো—বাড়ীতে থাকে, এটা-সেটা করে—আমি তো খাজনা আদায় করে বেড়াই।

—আপনি রাজী হোন। ওর খাওয়া থাকা আর শেখানোর ভার আমার আর—অধিকারী অল্প থেমে বললেন—ওর জন্য মাসে টাকা পনের আমি পাঠাব আপনাকে। পরে ও ভালভাবে শিখলে ওর মাইনে করে দেব—আশা করি ওর মাইনে ভালই হবে। তবে এখন এর বেশী দেওয়া যায় না।

—পনর টাকা বড্ড কম হচ্ছে যে।

—শুনুন ঘোষালমশাই—ও এখনো কিছু জানে না। কেমন দাঁড়াবে তাও বলা যায় না। কলকাতার খরচ, রেশনের চাল—কাপড়—জামা

ছাড়াও ওকে শেখাবার জন্য গানের মাষ্টার—এর পর পনর টাকা —এর বেশী পেরে উঠবো না। এতে যদি রাজি না হোন তো থাক।

অধিকারীমশাই উঠছেম—অসিত ঘোষাল তাড়াতাড়ি বললেন,

—উঠবেন না—এক কাপ চা খান। কথাটা ওর মাকে বলি,

—ও আচ্ছা—বলুন।

চা খাব—থিন্-এরারুট বিস্কুটসহ চা এল। ঘোষাল উঠে গেলেন ভেতরে। অনিমেষ ঐ ঘরেই একধারে বসেছিল। এতক্ষণে বললো,

—আমি কি পারবো শিখতে?

—কেন পারবে না। আমি নিজে তোমাকে শেখাবো।

—বাবা যদি যেতে না দেন!

—যেতে দেবেন। তোমার বাবার টাকা চাই—দরকার হয় কিছু বাড়িয়ে দেব আমি।

—আপনার দয়া—আপনি না নিয়ে গেলে মা হয়তো আমাকে ভিক্ষা করতে পাঠাবেন একতারা নিয়ে।

—বল কি! তোমার মা?

—না, সৎমা।

কথাটা বলতে বলতে অনিমেষ আন্দাজে এসে অধিকারীর পায়ের উপর পড়ল। ওর চোখে দরবিগলিত জলধারা। অধিকারী তাঁর চাদর দিয়ে ওর চোখ মুছে দিয়ে বললেন,

—ভেবো না—তোমাকে আমি নিশ্চয় নিয়ে যাব। তবে শোন—অকৃতজ্ঞ হয়ো না—নিমকহারামী করো না—দল ছেড়ে অন্য দলে পালিও না—বুঝলে।

—ঈশ্বর সাক্ষী—আমি কখনো তা করবো না।

—বেশ। বোসো।

ঘোষাল ফিরে এলেন। পিছনে তাঁর পত্নী ঘোমটা টানা। বললেন,

—আপনি আর কিছু বেশী দিলে আমাদের সংসারের কিছু সাশ্রয় হয়।

—আমার আবেদন শুনুন—এ বছরের যাত্রা মরশুম ফুরিয়ে এল। এখন বসিয়ে সবাইকে মাইনে দিতে হবে। মাস ছয়েক পরে পূজা-নাগাদ আমি ওকে তৈরী করে ফেলবো—তখন নিশ্চয় আপনি পঁচিশ টাকা করে পাবেন। তবে আমি কথা দিচ্ছি—দু'বছরের মধ্যে ওর মাইনে অন্তত শ'খানেক টাকা হবে।

—এখন আপনি কুড়ি টাকা করে দিন আমাদের।

—আচ্ছা—তাই হবে। ওর জামা-কাপড় যা দেবার ঠিক করে একটা বাক্সে ভরে আমাদের বাসায় পাঠিয়ে দেবেন—কাল সকালে ওকে নিয়ে আমরা যাব। আরো দু'যায়গার বায়না আছে, সেরেই যাব ঝরিয়া কোল ফিল্ডে।

—চিঠিপত্র পাব তো?

—হ্যাঁ—নিশ্চয়। মাঝে মাঝে ওর হয়ে আমিই চিঠি লিখে খবর দেব।

—নমস্কার জানিয়ে অধিকারী উঠলেন। অনিমেষ প্রণাম করলো।

—আজ আর তুমি টিকিট কিনে যেও না—আমি গেটে বলে রাখবো।

—আমাকে নিয়ে যাবে যে বন্ধুটি—তার জন্য?

—না—তারও টিকিট কিনো না—আজ তোমাদের বাড়ীর সকলের জন্যই ফ্রি পাশ দিচ্ছি—বলে অধিকারী মশাই একটা ফ্রি পাশ দিলেন।

অনিমেষের সৎমাই নিল পাশখানা

কথাটা পাকা হয়ে গেল—ফ্রি পাশও পাওয়া গেল। সৎমা খুবই খুশী। পাশ না পেলে ওর কপালে যাত্রা শোনা হয়ে উঠতো না। তাছাড়া মাসে কুড়িটা করে টাকা এখন থেকে পাওয়া যাবে—এ তার কাছে রাজার সম্পদ। অত্যন্ত অভাবের সংসার তার। ঐ কানা ছেলেটাকে অকারণ খেতে দিতে হয়—এর জন্য বৌ কোনো দিন খুশী নয়—কতদিন বলেছে।

—বেশ তো গান শিখেছে, এখন ওকে ট্রেনে ভিক্ষে করতে পাঠিয়ে দাও। নিজের পেটের যোগাড় নিজে করে আনুক! ঐ অন্ধকে পুষে লাভ কি।

আজ সেই সৎমাই একেবারে আনন্দে—ডগমগ হয়ে এসে বললো,

—এই নে সাবান—ভাল করে প্যাণ্ট আর জামাটা কেচে নে। গায়ে মাথায় তেল মাখ—স্নান করে খাবি। একটা ভাঙা সুটকেশ আছে ঐটাই নিবি।

যথেষ্ট। এতোটা কথা খুব কমদিনই খরচ করেছে এই সৎমা। কিন্তু একখানা জামা আর একটা প্যাণ্টই আছে আর আছে একখানা ছেঁড়া গামছা—তাই লুঙ্গীর মত করে পরে অনিমেষ। ভিজে অবস্থাতেই পরে—গায়েই শুকিয়ে যায়—আর একটা জামা আর প্যাণ্ট তো দরকার —না হোক—অধিকারী মশাই দেবেন—ভেবে অনিমেষ জামা-প্যাণ্ট কাচল, কতটা ফর্সা হোল কে জানে—শুকোতে দিল বারান্দায়। সৎমা আজ তাকে নিজের হাতে খেতে দিল। এমন করে আর কবে দিয়েছে মনে পড়ে না অনিমেষের। একখানা মাছও আজ দিয়েছে সৎমা।

খেয়ে বিশ্রাম করছে অনিমেষ আর ভাবছে, তাকে কালই যেতে হবে। যাওয়াই ভাল—এখানে কোনো সুখ নেই তার। ঈশ্বর যখন কৃপা করে ঐ অধিকারীর নজরে তাকে ফেলেছেন তখন নিশ্চয় তার জীবনটাকে সার্থক করে তুলবেন—এই কথাই তার মনে জাগছে।

কৈ—সেই জয়শ্রী না কি নাম—সে তো এল না। ভুলেই গেছে। কে আর একটা অন্ধ ছেলেকে মনে রাখে। যাক্ গে।

রাত্রে সপরিবারে যাত্রা শুনে এলেন ঘোষাল মশাই। ফিরেই সৎমা অনিমেষকে এক কাপ দুধ খাওয়ালো। দুধের আস্বাদ প্রায় ভুলে গেছে অনিমেষ। বলল,

—দুধ!

—হ্যাঁরে—গাইটা বিইয়েছে যে। খা—সকালেই তো যেতে হবে। তখন কি যে খেয়ে যাবি, তাই ভাবছি। মুড়ি-গুড় বেঁধে দেব গামছায়?

—তাই দিও।

সৎমা চলে গেল। আনন্দে না দুঃখে কে জানে অনিমেষের ভাল ঘুম হোল না। সকালেই ভাঙা সুটকেশটা নিয়ে যাত্রা করলো যাত্রা-পার্টির সঙ্গে অনির্দিষ্ট যাত্রা পথে।

॥ তিন ॥

পার্টিতে প্রায় পঞ্চাশজন লোক—চারজন মেয়ে। অধিকারী—রমেশ অধিকারী স্বয়ং এই যাত্রাদল গড়েছেন। গ্রাম দেশ থেকে নূতন এবং ভাল অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহ করা তাঁর স্বভাব। তাঁর দলের প্রায় সকলেই পল্লীর লোক—তাঁর যাত্রাগানেও অভিনবত্ব আছে। তিনি সাধারণ নাটক-নাটিকা গ্রহণ করেন না—নিজে গল্পের ছক্ এবং পাত্র-পাত্রীর চরিত্র ঠিক করে ভাল কোনো লোককে দিয়ে লিখিয়ে নেন—পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক অথবা সামাজিক সব নাটকেই কিছু না কিছু অভিনবত্বের ছাপ থাকে। তাই তাঁর এই যাত্রাদল বেশ নাম-ডাক করেছে। চলে ভালই।

প্রচারের মাধ্যমে এই দেশে আরো দু' তিন জায়গায় যাবার নিমন্ত্রণ এসেছে—কাছাকাছি রাণীগঞ্জে যাচ্ছেন তাঁরা—আজ বিকালে পৌঁছাবেন।

রাণীগঞ্জ পুরোনো সহর—অনেক লোকের বাস—সেখানে পঞ্চম-দোলের উৎসব হয়—মেলা বসে—যাত্রাও হবে।

অনিমেষ চলেছে ওদের দলে। অধিকারী সকলের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন—দলের চাকরকে বলে দিলেন—অন্ধ অনিমেষের চা, খাবার দেওয়া এবং তাকে গাড়ীতে নামানো চাপানোর ব্যাপারে যেন বিশেষ সাহায্য করা হয়। তিনি নিজেও অবশ্য দেখবেন।

জীবনে রেলগাড়ীতে চড়া এই প্রথম—গ্রাম থেকে বাইরে আসাও এই প্রথম তার—বাইরের জগৎ বিরাট বিস্তৃত একথা শুনেছে তার শিশু বন্ধুদের কাছে যারা মামাবাড়ী বা মাসীবাড়ীর গল্প বলতো।

কিন্তু গল্প শুনে কি আর বাইরের জগৎ বোঝা যায়। এই জন-

কোলাহল এই রেলগাড়ীর ভীষণ গতি—এই ঘোড়ার গাড়ীর দোদুল্যমান যাত্রা—এসব শুনে কেমন করে বুঝবে অনিমেষ। আজ তবু কিছু বুঝছে। কত কি প্রশ্ন জাগছে ওর মনে—কিন্তু অত কি জিজ্ঞাসা করা যায়। কে জানে ওরা কি মনে করবেন। হয়তো বিরক্ত হবেন। অনিমেষ ইচ্ছা স্বত্ত্বেও চুপ করে রইল। রাণীগঞ্জের বাসায় পৌঁছাল দল।

যাত্রাগান কি ভাবে হয়—কেমন করে হয় চোখে কখনো দেখেনি অনিমেষ। মাত্র গত কাল-পরশু কানে শুনেছে, কিন্তু তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাকে সাহার্য্য করেছে আন্দাজে ব্যাপারটা বোঝার। যদিও তার বোঝার মধ্যে বহু ভুল আছে তবু মোটামুটি একটা ধারণা তার জন্মেছে যাত্রাগান সম্বন্ধে। অনিমেষ কিছুক্ষণ পরেই জানতে পারলো—অধিকারী রমেশবাবু প্রচারপত্র দিচ্ছেন "নূতন আকর্ষণ—অন্ধ অনিমেষের অমৃত কণ্ঠ! আসুন—শুনে তৃপ্ত হোন।"

ব্যাপারটা কি ঘটবে—তখনো ঠিক বোঝেনি অনিমেষ। বুঝলো যাত্রা আরম্ভ হওয়ার কিছু পরে।

অধিকারী রমেশবাবু ওকে ভিক্ষুকের বেশে সাজিয়ে ওরই একতারাটা যা সে সঙ্গে এনেছিল তাই দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন আসরে। বলে দিলেন—সেই দোলেতে গাওয়া গানটা গাইবে অনিমেষ। ওর হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে ভিখারিণী বালিকা—দলেরই মেয়ে নাম ঝরণা। বয়স বছর আঠারো হবে। আসরে ঢোকবার আগে বললো,

—সঙ্গে কিন্তু আমিও গাইব।

—গাইবেন?

—কিন্তু গানটা তো আমি জানিনে।

—তাহলে?

—দেখা যাবে—আমি তো মন্দিরা বাজাবো।

—আচ্ছা।

ওরা আসরে ঢুকে পড়লো। হাতের একতারাটায় টুংটাং ধ্বনি করে অনিমেষ আরম্ভ করলো—"দোলেতে আওয়ে মেরা—মেইয়া কানাইয়া বেনু"—

ঝরণা মন্দিরা বাজাচ্ছে—তব্‌লার আওয়াজও উঠছে—তার সঙ্গে বেহালা। কী এক আশ্চর্য্য সুর অনিমেষের অমৃত কণ্ঠে থেকে ঝরতে লাগলো। সমবেত জনতা বিহ্বল হয়ে শুনছে—অকস্মাৎ তারা হর্ষধ্বনি করে উঠলো,

—আ হা হা!

—আর একবার—আর একবার গাওয়া হোক—

অধিকারী রমেশবাবু হাতজোড় করে বললেন,

—আদেশ শিরোধার্য্য—গাও অনি···

গানটা আবার গাইল অনিমেষ। আবার হর্ষধ্বনি—বিপুল জন-অভিনন্দন। অধিকারী ইঙ্গিত করলেন ঝরণাকে।

সে অনির হাত ধরে আসরের বাইরে গ্রীণরুমের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলল,

—আহা কি গলা তোমার।

—তোমার ভাল লেগেছে?

—শুধু আমার? সব্বারই—সত্যি খুব অবাক হয়ে গেছে সব।

—কত লোক হবেন ওরা।

—তা, হাজার হতে পারে।

—হা—জা—র! সে কত লোক।

—অনেক! এসো! আমাকে আবার রাজকন্যা ইন্দুমতী সাজতে হবে।

ঝরণা টেনে নিয়ে এলো ওকে সাজঘরে। সেখানে রমেশবাবু সস্নেহে আলিঙ্গন করলেন অনিমেষকে। বললেন,

—আমি রত্ন চিনি—বুঝলে হারাণ—ছ'মাসের মধ্যে ওকে গড়ে তোল।

—নিশ্চয়—নিশ্চয়—দলের গৌরব হবে ও?

সঙ্গীত শিক্ষক হারাণবাবু বললেন,

ঝরণা ইতিমধ্যে চলে গেছে রাজকন্যা সাজতে। রাজকন্যার সাজে আর ভিখারীর সাজে কি তফাৎ তা জানে না অনিমেষ, দেখার সৌভাগ্য থেকে সে বঞ্চিত তবে তার কল্পনা সাহায্য করলো। গল্পে শোনা রাজকন্যার বর্ণনার কথা রূপকথায় শোনা আছে বন্ধুদের মুখে। ভাবছে, ঝরণা ভিখারিণী হয়ে তার সঙ্গে গেয়ে এল—এবার রাজকন্যা হয়ে কোন রাজকুমারের সঙ্গে গাইবে। কিন্তু ওরা গাইছে না।

শুনতে পেল—আসরে ওরা বক্তৃতা করছে—ঝরণারই তো গলা—হ্যাঁ!

হারাণবাবু হঠাৎ প্রশ্ন করলেন,

—বাউল গান ক'খানা জান তুমি?

—বাউল—কীর্তন—রামপ্রসাদী সব নিয়ে আট দশখানা।

—বাঃ! তাহলে তো অনেকগুলোই। এতেই এখন চালাও। কলকাতায় পৌঁছে তোমাকে ট্রেণিং দিয়ে আমি ওস্তাদ বানিয়ে দেব—নাম করে ফেলবে দু'দিনে।

—আপনার কৃপা—আপনার আশীর্ব্বাদ।

হারাণ চৌধুরী খুব খুশী হলেন ওর কথায়। রমেশবাবুকে বললেন,

—এর গলার একটা বৈশিষ্ট্য আছে—লক্ষের মধ্যেও এ গলা একক। অসাধারণ।

—তার জন্যই তো আনলাম। তবে কি জান হারাণ, শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী করবার পর যখন ডানাপালক বেরুবে তখন যাবে উড়ে—এই তো হয়।

—না—না—ও তা করবে না।

—দেখা যাক—তবু চুক্তি একটা করে নিতে হবে ওর সঙ্গে।

—হ্যাঁ—তা নেবেন। তবে ও এখন নাবালক। ওর বাবার সঙ্গেই সেটা করিয়ে নেওয়া দরকার।

—সে তো বটেই। দু' একমাস যাক—পরে করলেই হবে।

এসব কথা শুনলেও খুব বেশী কিছু বুঝলো না অনিমেষ। বলল,

—বাবা—মা আমাকে মোটেই দেখতে পারেন না স্যার—ওদের সঙ্গে আর কেন চুক্তি।

—তুমি নাবালাক আছ—তাই। আচ্ছা, দেখা যাবে সেটা পরে। আপাততঃ শেখ ভাল করে।

—আজ কি আর গাইতে হবে আমায়?

—দেখি—জনগণ যদি চান তো গাইবে। আশা করছি তাঁরা চাইবেন।

অনিমেষ আর কিছু বললো না। ওদিকে আসরে অভিনয় চলছে।

অধিকারী ও হারাণবাবু চলে গেলেন। দলের প্রায় সকলেই বাইরে।

হঠাৎ কে যেন এসে তার চোখ টিপে ধরলো।

—ঝরণা—আমার চোখ টেপায় কোন লাভ নেই। না টিপলেও আমি দেখতে পাব না। তোমার রাজপুত্র কোথায়?

—রাজপুত্র? না তো—আমি কুমারী রাজকুমারী ইন্দুমতী—স্বয়ম্বরা হব।

—তারপর?

—তারপর সব রাজকুমাররা আসবে—তার মধ্যে থেকে মালা দেব কাকে জান? বৈশালীর রাজকুমার চন্দ্রভানুকে।

—তারপর?

—তারপর সে অনেক কাণ্ড—অত শুনে কাজ নেই। আমাকে আবার এক্ষুণি যেতে হবে। ঐ যে বেল পড়ল—যাই···

চলে গেল ঝরণা। ঝরণার মতনই চলে গেল। কিন্তু ঝরণা কেমন?

কাকে বলে ঝরণা। হায় ভগবান—তোমার জগতের কিছুই যদি দেখালে না—তবে বুদ্ধিটা দিয়েছ কেন? এই চিন্তা শক্তির কি দরকার?

হ্যাঁ দরকার আছে। এই শক্তি দিয়ে সে গান শিখতে পারবে—হয়তো অভিনয়ও করতে পারবে—হয়তো কোনো দিন রাজকুমার চন্দ্রভানু হয়ে ঝরণার মালাও পড়তে পারবে—ছিঃ কী সব ভাবছে।

দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনয় চলছে ওখানে। ঝরণা এর মধ্যে আরো দুবার এসে কথা বলে গেছে ওর সঙ্গে। দলের সকলেই ওকে স্নেহের চোখে দেখছে। মা-বাবার কাছে যা পায়নি কখনো অনিমেষ তাই পেল এই নিতান্ত অনাত্মীয়দের কাছে।

আর একবার যেতে হোল তাকে আসরে—এবার আর ঝরণা নয়—হীরাণবাবু নিয়ে গেলেন বৈতালিক সাজিয়ে।

আর একটা বাউল সঙ্গীত গাইল অনিমেষ। এটা আধুনিক যুগের লেখা বাউল গান। মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনলো সকলে। বলল,

—এমন আশ্চর্য্য গলা সত্যি শোনা যায় না।

গান শেষে বিছানায় শুয়ে কি জানি কেন বহুক্ষণ ঘুম এল না অনিমেষের। কত কি সে ভাবছে। সৎমা বা বাবার কথা নয়—সৎ ভাই-বোনদেরও কথা নয়—গ্রাম—গ্রামের সঙ্গীর কথা? না, তাও নয় কি যে ভাবছে, কে জানে! হঠাৎ অনিমেষের মনে হোল—সে এই দীর্ঘক্ষণ ধরে একটা কথাই ভাবছে—ঝরণার কথা।

কেন? এত লোক থাকতে ঝরণার কথাই ভাবতে গেল কেন? কে জানে কেন? তবে তার কথাই যে ভাবছে এতে আর সন্দেহ নেই।

দূর কর! অনিমেষ তার বাল্যবন্ধু মলয়ের কথা জোর করে ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে গেছে। জেগে দেখলো অধিকারী ডাকছেন।

—ওঠ—হাতমুখ ধুয়ে চা খাও।

—হ্যাঁ—উঠি।

॥ চার ॥

ওখান থেকে যেতে হবে সেনর‍্যালে কারখানায়—সেখানে আর টিকিট বেচার হাঙ্গামা নেই। ওখানকার কর্মিগণই যাত্রাগান করাবেন দুদিন—মোটা টাকা দক্ষিণা। রাণীগঞ্জ থেকে বাসে নিয়ে যাওয়া হবে দলটিকে। কোম্পানীর বাস নটার মধ্যেই এসে গেল। সাজ-সরঞ্জাম গুছিয়ে বাসে তুলে রওনা হয়ে গেলেন রমেশ অধিকারী মশাই।

কিন্তু তিনি ভাবছেন—অন্ধ গায়ক অনিমেষের নামে পাবলিসিটি দিতে হবে আরো ভাল করে। তাই দলের প্রচার কর্ত্তা অজিতবাবুকে অজিত বোসকে আসানসোলে নামিয়ে দিয়ে বললেন,

আসানসোলের একটা ছাপাখানায় একখানা হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে নেওয়া হোক—লেখা থাকবে—

"নির্ঝর নাট্যবীথির নবতম আকর্ষণ—
অন্ধ গায়ক শ্রীমান অনিমেষের অমৃতকণ্ঠের ঝঙ্কার।
তার সঙ্গে সুন্দরী সুকণ্ঠী ঝরণারাণীর অভিনয়—
আসুন—শুনুন—পরিতৃপ্ত হোন,
আমরা ধন্য হই আপনাদের আনন্দ দিয়ে।

রচনাটি নিজেই করেছেন রমেশবাবু। এসব কাজে তাঁর হাত পাকা! যদিও তাঁর রচনার মধ্যে সেকেলে হাতই বেশী খোলে, তবু তিনি লেখেন, বলেনও সেকাল-একাল কিছু নেই—সব কালই কাল সবই এক, শুধু ঢেলে সাজানো—যান ছাপিয়ে ফেলুন।

অজিত বোস নেমে গেলেন আসানসোলে। হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে তিনি সন্ধ্যা নাগাদ পৌছবেন যথাস্থানে। রমেশবাবু বললেন,

—শোন হারাণ—পৌঁছেই অনিকে আর ঝরণাকে তালিম দিয়ে নাও।

—হ্যাঁ—তা দিয়ে নেব। সারা দুপুরটা তো রয়েছে। কি শেখাব।

—নতুন কিছু না—যা অনি জানে তাই-ই ঝরণার সঙ্গে গাইয়ে নাও।

—বেশ—তার সঙ্গে ঝরণার নাচও তো চলতে পারে।

—পারে—যদি ভাল হয় তো তাই কর।

পরামর্শ ঠিক হয়ে গেল। যথাস্থানে নেমেই কাজ আরম্ভ করে দিলেন হারাণবাবু। বাসা দেওয়া হয়েছে একটা ফাঁকা যায়গায় একখানা বাংলো বাড়ীতে। এতএব অসুবিধার কিছু নেই।

ওরই কাছে একটা প্যাণ্ডেল বাঁধা হচ্ছে—যাত্রা হবে।

খাবার আগে—এবং খাবার পরেও হারাণবাবু তালিম দিলেন ঝরণা আর অনিমেষকে। দুজনে খুব কাছাকাছি বসে গান শিখছে ওরা। ঝরণা নাচলো—রমেশবাবু বললেন,

—চমৎকার হবে।

অনিমেষ ভাবছে—কি রকম? চমৎকার? সে তো দেখতে পাবে না।

—তার দেখা না দেখায় কিছুই এসে যায় না। রমেশবাবু খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

যথাকালে যাত্রা আরম্ভ হোল। কোম্পানীর পয়সায় যাত্রা হচ্ছে।

দূর দূর গ্রাম থেকে লোক এসে গেছে শুনতে। স্থানাভাব নেই। লোকে-লোকারণ্য হয়ে গেছে। গম গম করছে আসর—তদানুযায়ী আলোকসজ্জাও।

—বাবা! কত লোক। ঝরণা বললো,

—কত হবে? অনিমেষ শুধোলো।

—ওঃ তা হাজার পাঁচ-সাত – বা তারও বেশী !

কে জানে হাজাব পাঁচ-সাত লোক হলে কেমন দেখতে হয়। ঝরণা বলল,

—এবার আমাদের যেতে হবে। এই যা ! তোমার পরচুলোটা উঠে গেছে যে।

—ঠিক করে দাও।

ঝরণা সযত্নে ঠিক করে দিল। ওদিকে ঘণ্টা বাজলো – যাবার ইঙ্গিত।

ঝরণার হাত ধরে অনিমেষ পৌঁছাল আসরে। যেন একটি দেব-দম্পতী।

দুজনের চেহারাই সুন্দর – দুজনের সাজও সুন্দর – ওরা আজ রতী-মদন ! শিবের ধ্যান ভঙ্গ করতে এসেছে। ঝরণার নাচের সঙ্গে অনিমেষের গান আরম্ভ হোল।

রাত সাড়ে দশটা – জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রান্তরের মধ্যে এই গানের আসর। মুগ্ধ জনতা শুনছে অনিমেষের অমৃতপ্রসারী কণ্ঠস্বর – আশ্চর্য হয়ে তারা শুধু বললো,

—আহা !

—অপরূপ !

—কী কণ্ঠস্বর। যেন কিন্নর গাইছে।

—সত্যি – গন্ধর্ব কিন্নরের মত।

কিন্তু হরকোপানলে কামদেব ভস্ম হয়ে গেল। রতির বিলাপধ্বনি —অশ্রুপ্লাবী সঙ্গীতে ঝরণার, সেও কিছু কম মোহকরী নয়। শ্রোতারা ধন্য ধন্য করে উঠলো। অল্প পরেই পুনর্জীবনপ্রাপ্ত মদন-রতির গান—

মিলিত কণ্ঠে – সে যেন আর এক আশ্চর্য্য আর এক মায়ালোক।

—সত্যি ঝরণা নাট্যবীথির সুনাম সার্থক !

—চমৎকার নির্ব্বাচন – আচ্ছা শিক্ষা।

জনতার এই অভিনন্দন বাণী শুনছেন অধিকারী রমেশবাবু। বললেন,

—আপনাদের আনন্দ দিতে পেরেছি – আমাদের শ্রম সার্থক হোল।

অনিমেষও শুনলো এই প্রশংসাধ্বনি। অধিকারীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন, বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানায় একটু হাসি ফুটলো তার। উৎসাহ জাগলো মনে। ভাবতে লাগলো—ঈশ্বর করুণা করেই তাকে এই যাত্রদলে ঠাঁই করে দিয়েছেন। এর মর্য্যাদা সে যেন রাখতে পারে।

আসর থেকে ফেরার পথে ঝরণা বলেছিল,

—তোমার গান শুনে মানুষগুলো একেবারে অবাক্ হয়ে গেছে অনিদা!

—তোমার গানেও কম মুগ্ধ হয়নি।

—না—আমার গানে নয় – নাচ দেখে। নাচতে আমি সত্যি ভাল পারি।

—নাচ তো আমি দেখতে পাইনে!

গভীর গভীরতম বেদনা অনুরণিত হয়েছিল অনিমেষের কণ্ঠে। ঝরণা হয়তো বুঝেছিল—কিন্তু কি বলবে। তবু কিছু একটা বলা উচিৎ ভেবেই বলেছিল,

—তা হোক্ গে! আমি নাচ্‌বো – তুমি গাইবে – দুঃখ কি।

অনিমেষ আর কিছু বলেনি। কিন্তু ভেবেছিল – ঝরণার কথা কতখানি সত্যি? ক'দিন সে গাইবে আর ঝরণা নাচবে। তা কি হয়। ঝরণা কি চিরকাল থাকবে তার জীবনে। অসম্ভব! তবে য'দিন চলে এভাবে ত'দিনই আনন্দ।

পরদিন একটা সামাজিক নাটকের অভিনয়। আজ আর ঝরণাকে সঙ্গে পেল না অনিমেষ। ঝরণা আজ বধূ সেজে আসরেই আছে—

নববধূর বেশ তার অঙ্গে। পাশে তার নব বিবাহিত বর প্রবীর। অনিমেষ মাত্র একজন পথচারী ভিক্ষুক বেশে দাঁড়ালো এসে আসরে। একা – অত্যন্ত অসহায় বোধ হচ্ছিল নিজেকে তার। ঝরণা থাকলে মনে বল পেত।

—কি চাই ? – রূঢ় একটা প্রশ্ন করলো বর প্রবীর।

—আমি গান গেয়ে ভিক্ষে করি হুজুর।

—এখানে না – যাও – উধার যাও।

—হুজুর !

—যা – ও···কর্কশকণ্ঠে বলে উঠলো বর প্রবীর।

—আহা – গান একখানা গাইতে দাও না ওকে। ধমকাচ্ছ কেন ? ঝরণার কণ্ঠস্বর। অকস্মাৎ যেন হাতীর বল এল অনিমেষের অঙ্গে –

প্রবীর বললো,

—আচ্ছা – গাও – শুনে ভাল লাগে তো পয়সা দেব।

অনিমেষ গাইতে লাগলো –

"আমার মনের বনের কোন্ গোপনে লুকিয়ে ছিলে গো –
ও আমার হৃদয় বিহারী····"

অপূর্ব্ব অমৃত কণ্ঠ – শুনছে সব শ্রোতা – গান শেষ হোলে বধূ ঝরণা বললো,

—আর একটা গাইতে বল – খুব মিষ্টি গান।

—শুনবে আর ? শোন – এই গা আর একখানা –

অন্ধ অনিমেষ শুনতে পাচ্ছে শ্রোতাদের কণ্ঠ। বলছে সব,

—এই দলের অধিকারীর এই কৃতিত্ব। উনি নিত্য নতুন লোক আমদানী করেন। এই অন্ধ ব্যাটাকে আচ্ছা যোগাড় করেছেন। বাঃ খাসা !

অনিমেষ দ্বিতীয় গান শেষ করে ভিক্ষা নিয়ে ফিরছে। কে একজন পলাশ ফুলের একগাছা মালা পড়িয়ে দিল ওর গলায়। বলল,

—তোমার গান পলাশের মতই লাল—সুন্দর – মধুময় – হে তরুণ তোমার যাত্রাপথ পলাশের মতই রঙিন – সুন্দর সৌভাগ্যময় হোক।

—প্রণাম নিন।

অনিমেষ প্রণাম করলো যোড়হাতে।

আনন্দে উচ্চ করতালি ধ্বনি করলেন সমবেত শ্রোতাগণ। সকলেই বললেন,

—সুযোগ্য সম্মান – সোনার পদকের থেকেও মূল্যবান এই মালা।

আবার নমস্কার করে সাজঘরে ফিরে এল অনিমেষ। কয়েক মিনিট পরেই ঝরণা আর তার বরবেশী প্রবীরও ফিরলো। ঝরণা এসেই বললো,

—ও মালায় আমারও ভাগ আছে—দাও।

অনিমেষের গলা থেকে খুলে দিল মালাটা – পরলো না, খোপায় পড়লো ·· পড়তেই যাচ্ছিল, হঠাৎ তার নজর পড়লো প্রবীরের দিকে।

চোখ দুটো জ্বলছে প্রবীরের—হিংসায় নাকি। ঝরণা মালাটা তাই খোঁপায় পড়লো। প্রবীর বললো,

—ও গান গেয়ে মালা পেয়েছে – তোর কিসের ভাগ থাকবে রে ঝরণা ?

—থাকবে। ওকে তো আমিই নিয়ে যাই আসরে।

—তাতে কি। আজ তো নিয়ে যাসনি।

—তা হোক – তবু আমার ভাগ আছে।

ঝরণা আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল ওখান থেকে।

অনিমেষ চোখে ঝরণাকেও দেখেনি—প্রবীরকেও না—তবে শুনেছে – প্রবীর ভাল অভিনেতা। দলে তার খুব আদর – খুব

সুনাম। বয়স নাকি পঁচিশ। নায়কের ভূমিকায় সেই নাকি নির্ব্বাচিত হয়।

অনিমেষ ক'দিন এসেছে—প্রবীর এ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে কোনো কথা কয়নি। কে জানে কেন? দলের আর সবাই তো কথা বলে তার সঙ্গে।

অনিমেষকে সাজ রাখা একটা কাঠের বাক্সে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। বসে আসে সে। আজ আর তাকে গাইতে হবে না। কিন্তু যাত্রা শেষের পর অধিকারী স্বয়ং এসে তাকে নিয়ে গেলেন আসরে।

—আপনাদের সেবায় ধন্য এই অন্ধ গায়ক অনিমেষ ঘোষাল – আমার দলের গৌরব – আপনাদের আশীর্ব্বাদে ধন্য – কৃতার্থ হোক—

অনিমেষ করযোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওখানকার ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট গুপ্ত সাহেব উঠে এলেন – হাতে একখানা ঝকঝকে মেডেল – বললেন:

—তোমার কণ্ঠের যোগ্য সম্মান বাণীর বীণাযন্ত্র – সে তো নেই ভাই আমাদের প্রীতি-ভালবাসার চিহ্ন এই মেডেলটি আর এই গীটারখানি গ্রহণ কর।

মেডেলটি গলায় পরিয়ে দিলেন – গীটারটি দিলেন ওর হাতে।

অনিমেষ অশ্রুসজল চোখের দৃষ্টি দিয়ে তাকালো—বলল,

—আপনাদের এই দানের মর্য্যাদা যেন আমি বাণীর চরণমূলে পৌঁছে দিতে পারি।

কথাগুলো অবশ্য অধিকারী রমেশবাবু শিখিয়ে রেখেছিলেন অনিমেষকে।

সমবেত জনতা আবার হাততালি দিলেন।

॥ পাঁচ ॥

সকালেই ওদের আবার যাত্রা করতে হোল ধানবাদ – সেখানে যাত্রা হবে।

এর মধ্যে মুখে মুখে এবং হ্যাণ্ডবিলের সাহায্যে অন্ধ গায়ক অনিমেষের নাম প্রচার হয়ে গেছে এদিকে। অধিকারী রমেশবাবুর এ বিষয়ে কৃতিত্ব অসাধারণ। তিনি প্রচার করতে জানেন এবং করেনও। এখন তিনি ভাবছেন, তাঁর যে গোটা পাঁচেক নাটক সাধা আছে, তার কোনটার কোনখানে অনিমেষকে কেমন করে ঢোকানো যায়, এ বিষয়ে পরামর্শ আবশ্যক।

—অভিমন্যু বধে নায়ক প্রবীর নায়িকা ঝরণা, ওটাতে তো অনিকে ঢোকানো যাবে না – ঐ ভিখারী বেশেই গাওয়াতে হবে।

—ওকেই অভিমন্যু সাজালে কেমন হয়?

—না – না—তার জন্য পার্ট মুখস্থ করতে হবে—অভ্যাস করতে হবে। এমন করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তা সম্ভব নয়।

—এখন হবে না, তবে পরে ওকে অভিমন্যুই সাজাব আমি।

—কথাটা ভাল, তবে কি জান হারাণ—ও যে অন্ধ। ওকে পার্ট মুখস্থ করান শক্ত—তারপর যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যাপার—পারবে কি!

—নিশ্চয় পারবে—বললেন হারাণবাবু—তবে এখন গানই করুক।

এইসব কথা হচ্ছিল পথে বাসে যেতে যেতে। প্রবীরও ছিল সেখানে। ছিল অনিমেষও। প্রবীর যেন হিংস্র দৃষ্টিতে চাইল অনিমেষের পানে। অন্ধ অনিমেষ কিছুই দেখছে না—শুনছে, তাকে নিয়ে কি করা হবে—তারই আলোচনা। হঠাৎ প্রবীর বললো,

—অভিমন্যু বধে আমি তাহলে কি করবো?

—তোমার বিস্তর করবার আছে। তুমি তৈরী অভিনেতা—তুমি অনায়াসে জয়দ্রথের ভূমিকায় নামতে পার। ভীষ্মের ভূমিকাও নিতে পার। তুমি ওদিন রিজার্ভও থাকতে পার—দেখা যাক না, অনি কেমন দাঁড়ায়।

প্রবীর আর কিছু বললো না—বলবার তার সাহস নেই। কারণ রমেশবাবু দলের লোকের কথা কাটাকাটি পছন্দ করেন না। দল তাঁর কথায় চলবে এই তাঁর নীতি—নইলে শৃঙ্খলা থাকে না।

কিন্তু প্রবীরের মনে হোল—তার সর্ব্বস্ব যেন কেড়ে নিতে এসেছে অনিমেষ। সর্ব্বস্ব অর্থে এখানে ঝরণা—ঝরণা সাজে উত্তরা—তার প্রেমাত্মক কথা মধুর গান ও প্রবীরের জন্য বিরহ গাথা যখন আসরে চলতে থাকে তখন শ্রোতারা অশ্রুসম্বরণ করতে পারে না।

রণক্ষেত্রে মৃত্যুশয্যায় অভিমন্যুবেশী প্রবীর – লোকে সেইসব কথা শুনে মুগ্ধ হয়—মনে করে সত্যিই ঝরণা তার জন্য অশ্রুপাত করছে। ঝরণা তাকে ভালবাসে—এ ভালবাসা অক্ষয়।

কিন্তু এই ক'দিনে অনিমেষের আসার পর প্রবীরের অন্তরে যেন একটা কালো ছায়াপাত হয়েছে। অনিমেষের ঈশ্বরদত্ত আশ্চর্য্য কণ্ঠ-স্বরের আকর্ষণ তার অন্ধত্বের অসহায়তার আবেদনকেও ছাড়িয়ে যায় – যে শোনে সেই বলে—স্বর্গীয়। ও যদি আবার অভিনয় করে এবং দক্ষতা অর্জন করে তাহলে এই নির্ঝর নাট্যসম্প্রদায়ের সেরা তারকা হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই। এটা যেন সহ্য হচ্ছে না প্রবীরের। অনিমেষ কাছেই বসে আছে। প্রবীর বললো,

—পারবে অভিনয় করতে?

—কি জানি—কখনো তো করি নি।

—তুমি গান শিখলে কি করে?

—একজন বাউল শিখিয়েছেন।

—কিন্তু বাউল ছাড়া অন্য গানও তো জান—দেখছি।

—আমার বন্ধু মলয়ের গ্রামোফোন আছে। রেকর্ড চালিয়ে চালিয়ে তার সঙ্গে গেয়ে আমরা অভ্যাস করি দু'জনে—মাত্র তিন চারটা গান।

—মলয় কেমন গাইতে পারে?

—পারে—তবে খুব ভাল না।

—সেও আসবে নাকি দলে?

—আজ্ঞে না—সে কেন আসবে? সে পড়ে—এবার কলেজে পড়বে।

—শোন, তুমি গানই শেখ। অভিনয় করতে যেও না। অন্ধ মানুষ কে জানে কখন হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে—বুঝলে।

—আমার কি করবার আছে বলুন। আমি মাত্র হুকুমের চাকর। যা আপনারা করাবেন, তাই করতে চেষ্টা করবো।

প্রবীর আর কিছু বললো না? কারণ সে জানে অধিকারী রমেশবাবুই এখানে সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনি যা করাবেন, তাই হবে।

ধানবাদে পৌঁছাল পার্টি। কয়লার দেশ—কারখানার দেশ—রুক্ষ নিরস দেশ—বিশেষতঃ এই ফাল্গুন-চৈত্র মাসে—কিন্তু ঐ দেশেই বসন্ত-সমারোহ পলাশের বনে শালপিয়ালের শাখার শ্যামালতার মঞ্জরীতে।

যাত্রাপার্টির বাসা দেওয়া হয়েছে একটা টিলার উপর একখানা বাড়ীতে। বাড়ীটা নাকি কোন এককালে একজন সাহেবের বাংলো ছিল—এখন পড়ো হয়ে আছে, তবে থাকা চলে। ওর সামনে—পিছনে বন—বড় বড় শালগাছ—যাদের পাতায় কয়লার ধোঁয়া লেগে সারা বছরই প্রায় কালো হয়ে থাকে।

এখন কিন্তু পাতা ঝরে নতুন পাতা গজিয়েছে—আর ফুটেছে অজস্র ফুল—কী সুন্দর গন্ধ। বিকালের দিকে অনিমেষকে ঝরণা বললো,

—চল অনিদা—বাইরে বসবে।

—চল—নিয়ে চল।

ঝরণা হাত ধরলো ওর। নিয়ে এল বাইরে। উঁচু বাড়ীটার নীচে বনস্থলী—শ্যামল সুন্দর বনের আশ্চর্য মোহকরী রূপ। কোথায় একটা কোকিল ডাকছে।

—কী যে সুন্দর এই জায়গাটা অনিদা—এমন কখনো দেখিনি।

—কি যেন গন্ধ আসছে।

—শাল ফুলের গন্ধ। মস্ত বড় বড় গাছ—আম গাছের চেয়েও বড় আর কি উঁচু।

—আমি তো আম গাছও দেখিনি।

—ও হ্যাঁ—আকাশ ছোঁয়া।

—আকাশই বা কবে দেখলাম।

—আচ্ছা।

কথাটা যেন অতর্কিতে বেরিয়ে গেল মুখ থেকে ঝরণার। সামলে বললো,

—নাইবা দেখলে— আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু বোঝানো সম্ভব নয়। জন্মান্ধই বলা চলে অনিমেষকে। পৃথিবীর আলো সে দেখেছে, কিছুই মনে পড়ে না। অনেক চেষ্টা সে করেছে তার মার মুখখানা মনে করতে, না—পারেনি। ছোটবেলার একটা বস্তুর কথা তার মনে আছে একটি ফুল—কাগজের খেলার ফুল। কে যেন দিয়েছিল তাকে—শুয়ে শুয়ে দেখতো। কিন্তু সে স্মৃতি হয়তো স্বপ্ন। হয়তো যা ভাবছে তা নয়।

ঝরণা বোঝাতে পারলো না তবু কিছু যেন বুঝলো অনিমেষ। না বুঝলেও বললো,

—হ্যাঁ—বুঝেছি। তাহলে আমরা বনের মাঝে আছি।

—না—ঠিক মাঝে নয়। আগে হয়ত এগুলো বন ছিল, এখন কেটে কেটে ফাঁকা করে দিয়েছে—খুব বড় বড় কয়েকটা শাল আর পলাশ গাছ।

—খুব মিষ্টি গন্ধ। কোন ফুলটার—শাল না পলাশের?

—শাল ফুলের। পলাশ ফুল কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর—লাল—টকটকে লাল।

—হ্যাঁ—লাল রংটা আমি যেন চিনি। আর কি কি রং আছে এখানে?

—সবুজ—সাদা—হল্‌দে—নীল—বেগুনী—কত রকমের রং রয়েছে ফুলের—যায়গাটা খুব ভাল অনিদা। কে জানে ক'দিন থাকবো এখানে। তবে আমার খুব ভাল লাগছে।

—আজ কি পালা হবে ঝরণা?

—অভিমন্যু বধ! আজ আবার ভিখারীর সাজে আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

—কি গান গাইবে আজ?

—কে জানে। হারাণবাবু যা গাইতে বলবেন।

—না, আমি বলছি আজ গাইবে,

"আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটবে গোলাপ—ফুটবে।

দলের চাকর হরিচরণ এসে বললো,

—কর্ত্তা ডাকছেন আপনাদের।

—যাই।

দুজনে উঠে এল। মাঝ পথে প্রবীর বললো,

—পার্টটা ঝালিয়ে নে ঝরণা—মুখস্থ ঠিক আছে তো?

—হ্যাঁ—এই তো পরশু গেয়ে এলাম।

—তবু একবার সেই যুদ্ধে যাবার বিদায়ের সীনটা—

—না—ওটাতে আমার কান্না পায় না—কাঁদতে হয় তবু। চোখের কাজল যায় ধুয়ে। ও এখন থাক—সেই সময়েই হবে।

চলে এল ঝরণা। অধিকারী দুজনকেই ডেকেছেন। অনিমেষও এল।

অধিকারী ওদের বসিয়ে বললেন,

—আজ তোমাকে দু'খানা গান গাইতে হবে—কি গাইবে হারাণের কাছে ঠিক করে নাও।

—যে আজ্ঞে!

—এদিকে এসো।

হারাণবাবু ওদের দুজনকে বসিয়ে গানের তালিম দিতে লাগলেন। ওদিকে দলের অন্য সব লোক চলে গেল গানের আসরের কাছে সাজ-ঘরে। হারাণবাবু বললেন,

—তোমাকে বেতারে গাইবার ব্যবস্থা করে দেব!

—আপনার কৃপা।

—হ্যাঁ—কিন্তু শোন—বেইমানি করো না—গান শিখলে তোমার দাম অনেক হবে। তখন আমাদের আর মনে থাকবে না হয়তো।

—তা কি হয়?

—হয়। এই রকমই তো হয়। আশা করি তোমার ক্ষেত্রে তা হবে না।

—আজ্ঞে না—নিশ্চয় না। আপনি শিক্ষাগুরু আপনার সেবাই আমার ধর্ম্ম বলে মনে করি—আর উনি অন্নদাতা—পিতার সমান।

—খুব ভাল কথা। এই যে ঝরণা—ওর নাম ঝরণা নয়—ওটা আমাদের দেওয়া নাম—ওর সত্যি নাম কুড়ুনী। ওকেও আমরা তোমার মত এক পাড়াগাঁ থেকে কুড়িয়ে এনেছি। শেখালাম নাচ—গান—

অভিনয়—এখন যদি অন্য দলে চলে যায় তো কেমন বেইমানী হবে বোঝ তো।

—কবে আমি চলে যাব বলেছি স্যার? ঝরণা ঝঙ্কার দিল।

—বলিসনি—বলতে কতক্ষণ! দশ বিশ টাকা মাইনে বেশী দিলেই চলে যাবি।

—কখ্খনো না—টাকার জন্য আমি কখনো যাব না—দেখবেন।

হারাণবাবু আর কিছু বলেন না। ওদের নিয়ে সাজঘরের দিকে রওনা হলেন। ঝরণাই হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে অনিমেষের।

॥ ছয় ॥

অনিমেষ চলে যাওয়ার পর থেকে মলয়ের মনের অবস্থা খুব খারাপ। সে ধনীর ছেলে—কলেজে পড়ছে। দোলের সময় বাড়ী এসেছিল। অনিমেষ অন্ধ হলেও মলয়ের বিশেষ বন্ধু। ছোটবেলা থেকেই ওদের দুজনের বন্ধুত্ব। মলয়ের বাবা একজন দেশকর্ম্মী—বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করেছেন। থাকেন কলকাতায়। মলয়ও থাকে তাঁর কাছেই। কাল মলয় চলে যাবে কলকাতা।

আজ সকালে তাই অনিমেষের বাড়ীতে একবার খবর নিতে এল।

—আয়—বললে অনির সৎমা—কবে কলকাতা যাবি?

—কাল। অনির কোনো খবর আসে নি?

—না—এই তো দিন পাঁচ সাত গেছে। ভালই থাকবে।

—হ্যাঁ—তবে চিঠি দেব বলেছে।

—চিঠি তো সে নিজে লিখতে পারবে না। কেউ লিখে দিলে তবে তো।

—হুঁ।

মলয় আর কিছু বললো না। অনির সৎমাই বললো,

—তুই তো কলকাতায় থাকিস। অনির কাছে যেতে পারবি তো?

—হ্যাঁ—ওদের ঠিকানা আমি নিয়ে রেখেছি।

—তাহলে গিয়েই খবর করবি।

—না—ওরা তো এখন বাইরেই গান করবে। ফিরবে বৈশাখ মাস নাগাদ।

—ও হ্যাঁ—তা তখন খবর নিবি। অনির একটা হিল্লে হোল। গান শিখলে যাত্রাদলে ওর নাম হবে। মাইনেও ভাল পাবে।

—হ্যাঁ—তবে কে জানে, কেমন সে থাকবে সেখানে!

মলয়ের কণ্ঠ বিরস। কারণ যাত্রাদলে অন্ধ অনিমেষ ভাল থাকবে, সে মনে করে না। তবে বাড়ীতে সে খুবই খারাপ অবস্থায় ছিল—জানে মলয়। তাই একটু ভেবে বললো,

—ঐ আশাতেই তো পাঠালাম আমরা। মানুষ হোক—তবে কে জানে—মানুষ হলে আবার আমাদের মনে রাখবে কি না।

মলয় উত্তরে কিছু বললো না। সে জানে কুড়িটি টাকা পাবে এই আশায় এই সৎমা অনিকে নির্ব্বাসন দিয়েছে—নইলে অন্ধ অনিকে অবিরাম তাড়না করাই তার কাজ ছিল। যাই হোক—অনির কোনো চিঠি আসেনি—এই খবরটা নিয়েই সে চলে এল। কলকাতা পৌঁছে নিশ্চয় ঐ যাত্রাপার্টির ঠিকানায় সে যাবে অনির খবর করতে।

ফিরবার পথে অনির বাবার সঙ্গে দেখা। তিনি বাজার করে ফিরছিলেন।

—কি রে মলয়—কোথায় গিয়েছিলি।

—আপনার বাড়ী—অনির কোনো খবর তো আসেনি?

—না—ওরা এখন খনি অঞ্চলে গান করবেন।

—হ্যাঁ—তবু চিঠিপত্র তো দেওয়া উচিৎ।

—দেবেন হয়ত। কলকাতায় গিয়ে তুই খবর রাখিস—যেন বিগড়ে না যায়।

—হ্যাঁ রাখবো।

মলয় চলে এল। অনির জন্য এরা এখন মাসে কুড়িটা টাকা পাবে তাই তার সম্বন্ধে চিন্তা—নইলে অনিমেষ নামে যে বাড়ীতে একটা অন্ধ

ছেলে আছে তাও এদের মনে থাকতো না। কতদিন অনি না খেয়ে থেকেছে জানে মলয়। অনি যদি সত্যি মানুষ হয় তো ভগবানের সাহায্যেই হবে।

পরদিন কলকাতা এল মলয় এবং তার পরদিনই এল গরাণহাট্টা নির্ঝর নাট্যশালার অফিসে। ওখানে যিনি ছিলেন তিনিই বললেন,

—দল এখন কাতরাসগড়ে আছে। ওখান থেকে আরো পাঁচ-সাতটা যায়গায় যাবে—শেষ না হলে ফিরে আসা সম্ভব নয়।

—অনিমেষ নামে যে নতুন লোকটিকে নেওয়া হয়েছে তার কথা কিছু জানেন আপনি।

—হ্যাঁ—অধিকারী মশাই লিখেছেন আমায় ছেলেটি অন্ধ—গলা ভাল—শেখালে ভাল গাইতে পারবে। তার নামে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। তোমার কে হয় সে?

—আমার ছোটবেলার বন্ধু?

—তুমি কি কর?

—পড়ি—বিদ্যাসাগর কলেজে।

—ভাল। মে-জুন নাগাদ ফিরবে ওরা—তখন খবর নিও।

—আচ্ছা।

নমস্কার করে চলে এল মলয়। অনিমেষ ওখানে কি ভাবে চলা-ফেরা করছে। কেমন খাওয়া-দাওয়া—কখন খায়, কখন ঘুমায়, ইত্যাদি নানা চিন্তা তার মনকে ব্যাকুল করে। কিন্তু কিছুই তার করবার নেই। অপেক্ষা করতে লাগলো মে-জুন মাসের। মাঝে এক দিন গরাণহাট্টা অফিসে ফোন করে খবর নিল—শুনলো পার্টি এখনও আসেনি কলকাতায়।

নিজের পড়াশুনো নিয়ে কাটাচ্ছে মলয়। তবে অনির চিন্তা সে করে—প্রায় প্রতিদিনই চিন্তা করে তার কথা।

হঠাৎ সেদিন একখানা চিঠি পেল মলয় অনিমেষের কাছ থেকে। হাতের লেখাটা মেয়েলী। কিন্তু সুন্দর হস্তাক্ষর। লিখেছে—

ভাই মলয়,

তোর কোনো খবর জানি না—আশা করি ভাল আছিস এবং পড়াশোনা ভালই করছিস। আমি শারিরীক ভাল আছি—কিন্তু বেশী ভাল আছি বলা চলে। ভাল খাই—পড়ি কোনো কষ্ট নাই। অধিকারী মশাই এবং সঙ্গীত পরিচালক হারাণবাবু আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। দলের সকলেই ভালবাসে। গানও শিখছি এবং গাইছি আসরে।

অন্ধ—তাই কিছুই দেখিনে—কাউকে দেখিনে—শুধু এদের স্নেহের পরশ অন্তর দিয়ে অনুভব করি। এ ছাড়া এখানে আমি একটি অমূল্য রত্ন লাভ করেছি—একটি তরুণী—নাম ঝরণা, সেই আমার হয়ে তোকে এই চিঠি লিখে দিচ্ছে। সে দেখতে কেমন জানিনে, কিন্তু স্নেহমমতা আমাকে পরম আশ্রয় দিয়েছে। এখানে সেই আমাকে হাত ধরে আসরে নিয়ে যায়—আমার সঙ্গে গান করে আমাকে চালায়। কলকাতায় পৌছালে তুই এসে দেখা করবি। ঝরণার সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দেব।

আমরা কোথায় কখন থাকবো ঠিক নেই। তাই তোর পত্র পাওয়ারও সম্ভাবনা নেই। আমরা আগামী জুন মাসের গোড়ার দিকে কলকাতায় ফিরবো—আশা করি। ফিরেই তোকে জানিয়ে দেব। প্রীতি ভালবাসা জানবি। ইতি—

তোর অনিমেষ।

পত্রখানা প্রায় তিনবার পড়লো মলয়। তার এই বাল্যবন্ধু তাহলে ভাল আছে। ঝরণা নামে একটি মেয়েও জুটেছে তার সঙ্গিনী। খুব

আনন্দ হোল মলয়ের। অনিমেষ উন্নতি করুক। সে যেন ভাল নাম করতে পারে। ইত্যাদি প্রার্থনাও করলো মলয়।

প্রায় মাসখানেক পরে পেল একখানা পোষ্টকার্ড।

ভাই মলয়,

আমরা কলকাতায় ফিরেছি। এসে দেখা কর। বাকী কথা সাক্ষাতে। ইতি—

তোর অনিমেষ।

মলয় তারপর দিনই গেল গরাণহাট্টায়। গিয়ে শুনলো অনিমেষ রমেশ অধিককারী মশাইএর বাড়ীতে থাকে। ঠিকানা বলে দিলেন ওখানকার অফিসার। মলয় সেখানে গেল। গিয়ে দেখলো—অনিমেষ ঝরণা এবং আরো কয়েকজন রয়েছে—গান শেখানো হচ্ছে। মলয়কে অভ্যর্থনা করলো ওরা।

অনিমেষ পরিচয় করিয়ে দিল ঝরণার সঙ্গে তার। ঝরণা বললো,

—আপনার কথা কত যে শুনেছি অনিদার মুখে—আজ দেখলাম।

—আমি তো চিঠিতেই শুনেছি দু'চার কথামাত্র। দেখবার জন্য ছট্‌ফট্ করছিলাম। এখন আপনাদের কেমন কি চলছে বলুন?

—চলছে ভালই। এখন নতুন পালার তালিম চলবে, নতুন বই ধরা হবে—এবার নাকি যে বই ধরা হবে তার নায়ক অন্ধ—অনিদাই নায়ক হবে।

—বাঃ! তাহলে তো ভালই। নায়িকা তো আপনি?

—এখনো ঠিক হয়নি। আমি হয়তো পাশে পড়ে যাব।

—সে কি? কেন?

—কারণ এই গল্পে অন্য এক নায়ক আছে—আমি সেখানেই নায়িকা হব—গল্পটা সামাজিক। আমার যেখানে যাওয়া উচিৎ তা হোল না—অন্য একজন গেল—আর আমি গেলাম অন্য এক যায়গায়। এই নিয়েই গল্প।

—শেষ কি! পরিণতি কোথায়?

—ভাল নয়—আমায় উদবন্ধনে মরতে হবে।

—দূর!

—হ্যাঁ এই রকমই গল্প—আমার জন্য লোকে খুব কাঁদবে আর অনিদা বলবে—আচ্ছা হয়েছে। দেখ মজাটি!

—শয়তানি কোথাকার! অনি বললো—ওরে বিশ্বাস করিসনে মলয়—ও মুখে মুখে গল্প রচনা করে বলতে পারে। নতুন বই-এ কি আসবে তা এখনো আমরা জানিনে। শুধু অধিকারী লেখক মশাইকে বলেছেন—'নায়ক' অন্ধ—এই রকম একটা সামাজিক নাটক লিখতে হবে।

—ও—তাহলে আপনি তো দেখছি নিজেই গল্প বানাতে পারেন।

—পারি তো। তাতে কার কি লাভ হবে? আমার গল্প নিয়ে তো নাটক হবে না।

—হবে না কেন? হতেও তো পারে। কে জানে, কার ভাগ্যে কি লেখা থাকে।

—আমার ভাগ্যে যদি এমন কিছু থাকে তো আপনি নিশ্চয় খুব খুশী হবেন।

—নিশ্চয়! নিশ্চয়।

অধিকারী রমেশবাবু এসে পড়েলেন। মলয়কে তিনি চেনেন। মলয় তৎক্ষণাৎ উঠে প্রণাম করলো ওঁকে। সস্নেহ আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বললেন,

—এসো মাঝে মাঝে। তোমার বন্ধুর যথেষ্ট উন্নতির আশা আছে। যদি ঠিকমত তালিম নেয় তো নাম করে ফেলবে।

—আপনার পদপ্রান্তে যখন আশ্রয় পেয়েছে তখন নিশ্চয় ওর জীবন সফল হবে স্যার।

আবার প্রণাম করে মলয় বিদায় নিল।

॥ সাত ॥

"অন্ধ গায়ক অনিমেষের অমিয়কণ্ঠ"—"অমিয়কণ্ঠী অন্ধ গায়ক অনিমেষ" অথবা—"অন্ধ অনিমেষ প্রধান ভূমিকায়" ইত্যাদি বিজ্ঞাপন চলছে কাগজে ও পোষ্টারে। হ্যাণ্ডবিল এবং অন্যান্য প্রচারপত্রও কম নয়। ঝরণা তাই বলল,

—তোমাকে বুম করতে উঠে পড়ে লেগেছেন বড়কর্ত্তা—জান অনিদা তোমাকে একেবারে মটকায় তুলে ছাড়বেন।

—মটকায়? সে কোথায়?

—সে আছে – হাসলো ঝরণা – সে তুমি বুঝবে না।

—তোমাকেও নাকি তুলছে?

—হ্যাঁ অনিদা আমাকেও তোমার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে।

—তাহলে দুজনেই মটকায় যাব।

—যাব – যেতে আমাদের হবেই—ওরা তুলবে। কিন্তু কি জান? এই প্রবীর···

—কি করলো প্রবীর?

—মুস্কিল করছে। এতদিন সেই ছিল নায়ক এখন তোমাকে নায়ক করায় আর তার সঙ্গে আমাকে নায়িকা করায় ওর রাগ হচ্ছে—হিংসে হচ্ছে। ও যেন সহ্য করতে পারছে না। আমাকে বার বার বলছে ঐ কাণা ছোঁড়াটার সঙ্গে অভিনয় করলে আমার নাম খারাপ হয়ে যাবে—বদনাম হবে ইত্যাদি—

—তুমি কি বলছো?

—আমি কি বলবো! অধিকারী যা করাবেন তাই করতে হবে। কিন্তু প্রবীর খুব আপত্তি করছে। ও নাকি দল ছেড়ে চলে যাবে এর জন্য

—এতোখানা ?

—হ্যাঁ।

—আমরা এর কি করতে পারি ঝরণা। যা করবার অধিকারী মশাই করবেন।

—হুঁ—আমাদের কিছু করবার নেই।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। মিনিট কতক পরে ঝরণা বলল,

—তোমাকে নতুন বইএর পার্ট মুখস্থ করতে হবে।

—পারবো তো ?

—পারবে না কেন ? আমি মুখস্থ করিয়ে দেব। তা ছাড়া তোমার সেই বন্ধু মলয় আছে। সে নাকি বলেছে তোমাকে পার্ট মুখস্ত ঝরিয়ে দেবে।

—না—না, তার পড়ার ক্ষতি হবে। সে ভাল ছেলে—তাকে কেন ডাকলে ?

—আমি ডাকিনি - ডেকেছেন অধিকারী মশাই নিজেই। মলয় হয়ত আমাদের দলে যোগ দেবে। লোকের তো দরকার। যদি সে আসে তো খুব ভাল হয়।

—তোমার খুব ভাল লেগেছে মলয়কে ?

—হ্যাঁ - খুব ভাল ছেলে !

সেই দিনই সন্ধ্যার পর মলয় সত্যি এল। আজ নাকি নতুন নাটকটা শোনানো হবে। মলয়ও শুনবে। অবশ্য এখানকার অভিনয়ে সে যোগ দেবে কিনা—তা এখনো ঠিক হয়নি, তবে মলয়ের উপর অধিকারীর নজর আছে। যদি আসে তো নেবেন তিনি তাকে। মলয় এসে বলল,

—আমি নাটকটা শুনতে এলাম। তোর পার্টটা কেমন হবে শুনবো।

—তুই দলে যোগ দিবি নাকি ?

—না—বাবা আমাকে দলে যোগ দিতে দেবেন না। তবে আমি হয়ত গোপনে যোগ দিতে পারি বাড়তি অভিনেতা হিসাবে।

—তা বেশ! কিন্তু তোর বাবা জানতে পারলে মুস্কিল হবে।

—জানতে পারবেন না।

এরপর অধিকারীর আহ্বানে ওদের যেতে হোল নাটক শুনতে।

এক অন্ধ যুবকের জীবন নিয়ে লেখা এই নাটক। যুবক অন্ধ—কিন্তু অগাধ ধন-সম্পদের মালিক। এই ধনের জন্যই এক সুন্দরী দরিদ্র কন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু স্ত্রী-নিবেদিতা অন্ধ স্বামীকে ভালবাসে না। তার প্রেমাস্পদ অন্য এক যুবক। অন্ধ সুখেন্দুসুধা ক্রমশঃ বুঝতে পারে। বুঝতে পারে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ঔদাসিন্য অবহেলায় পাতান রাজা নলিনীর সঙ্গে তার ক্রমাগত বাইরে যাওয়া ক্লাবে যোগদান—প্রাত্যহিক পার্টি পিকনিকের আতিশয্যে। অনুনয় করে—অনুযোগ করে নিবেদিতা গ্রাহ্য করে না। মর্ম্মান্তিক ক্ষোভে একদিন ঘর ছেড়ে চলে যায় অন্ধ অজানা পথে। কোথায় গেল কেউ জানে না। কার সাহায্যে গেল, তাও জানে না। নিবেদিতা স্বামীর পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তির মালিক হয়ে জীবন সুখময় করে তুলবার কল্পনা করলো। সে প্রচার করে দিল—তার স্বামী হঠাৎ বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে—পরে কোথায় গিয়ে আত্মহত্যা করেছে। অতএব সেই এখন সব কিছুর মালিক।

বছর দু' তিন কাটলো—নিবেদিতা তার প্রেমাস্পদকে বিয়ে করেছে—স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখেই আছে সে—হঠাৎ খবর এল—উত্তর প্রদেশের এক হাসপাতালে তার স্বামী সুখেন্দু অর্দ্ধমৃত—কিছু টাকা নিয়ে নিবেদিতা যেন যায় সেখানে অবিলম্বে।

খবরটা শুনলো নিবেদিতা—ঐ শোনা পর্য্যন্তই। কিছুই সে করলে না এ ব্যাপারে। আবার বছরখানেক কাটলো। কোনো

খবর নেই। নিবেদিতা ভেবেছে হাসপাতালে সুখেন্দু মারা গেছে। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন সুখেন্দু ফিরে এলো নিজের বাড়ীতে। জনৈক বদান্য ডাক্তারের দয়ায় সে ভাল হয়েছে।

সম্পত্তির মালিকানা এখন সুখেন্দুর। নিবেদিতা তার প্রেমাস্পদকে বলল,

—আমাদের তো চলে যেতে হবে।

—হ্যাঁ—তাছাড়া আর উপায় কি।

–সুখেন্দু শুনলো—নিবেদিতা নিরুপায় হয়ে চলেই যাবে। সে বললো,

—আজকার রাতটা ভাববার সময় দাও। দরকার হয় কাল যেও। সুখেন্দু তো চলেই গিয়েছিল – আবার চলেই যাবে।

পরদিন সুখেন্দুকে আর পাওয়া গেল। রাত্রের অন্ধকারে সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কেউ জানলে না সুখেন্দু এসেছিল চলে গেছে।

নিবেদিতা ভালই আছে স্বামী সংসার নিয়ে। গান শিখছে তার বালিকা কন্যা।

"অন্ধজনে দয়া কর—দীনজনে কর দান—"

বহুদূরে কোথায় এক বছরের গলিতে সুখেন্দু ঠিক ঐ সময় গান গেয়ে ভিক্ষা করছে।

"অন্ধজনে দয়া করা—দীনজনে কর দান—"

একই করুণ গল্পটিকে নাটকের মধ্যে পরিবেশন করা হয়েছে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে। গল্পের চেয়ে নাটকে রসটা ভালই ফুটেছে। তাই সকলে এই নাটক পছন্দ করলো। অনেকগুলি গান আছে যা অন্ধ অনিমেষকে দিয়ে গাওয়ানো চলবে। শেষের গানটা অত্যন্ত করুণ—গান গাইতে গাইতে সুখেন্দু পথের পাশে রক্তবমি করে মরলো। এই শেষ দৃশ্য নাটকের।

অনিমেষকে সুখেন্দুর ভূমিকায় নামানো হবে। মলয় বললো,

—গল্পটায় খুব নূতনত্ব নেই – তবে বলার ভঙ্গীতে ভাল লাগলো। গানগুলোও ভাল – দেখা যাক – কেমন দাঁড়ায়।

—ভালই দাঁড়াবে – নাম দেব – জীবন জ্বালা।

অধিকারী রমেশবাবুই বললেন। কারো আর কিছু বলবার নেই। প্রবীর এই গল্পে নিবেদিতার প্রেমিকা হয়ে অভিনয় করবে – নায়িকা ঝরণা।

ঝরণার মোটেই ভাল লাগেনি গল্পটা। কিন্তু উপায় নেই। ভাল লাগার প্রশ্নই এখানে অবান্তর। দলের যা মত তাই করতে হবে।

সে স্বাধীন নয়। তবু বললো,

—আমার বদলে মীরাদি করুন এই নিবেদিতার পার্ট ভাল হবে।

—না – গান সে ভাল গাইতে পারে না। তাছাড়া তোকেই নির্ব্বাচন করে এই সার্থক রচনা করা হয়েছে। গল্পের ছকটা প্রবীরের দেওয়া।

—ও –

এইটুকু বলেই ঝরণা আর কিছু বললো না। অনিমেষকে পার্ট মুখস্থ করানো আর অভিনয় দেখানোর ভার নিলেন হারাণবাবু। অনিমেষের স্মৃতিশক্তি প্রবল – মুখস্থ করতে দেরী হবে না।

পরদিন এক সময় ঝরণা বললো অনিমেষকে,

—এবার থেকে তোমাকে হেনস্থা করা অভ্যাস করতে হবে – বুঝেছ ?

—হ্যাঁ – কিন্তু কেন ?

—কারণ – অভিনয়কে সত্যি রূপ দেবার জন্য।

—বেশ – তাহলে প্রবীরদাকে তো ভালও বাসতে হবে।

—অভিনয় করতো ভালবাসার !

– সেখানেও তো সত্যি রূপ দিতে হবে।

—না দিলেও চলবে।

অনিমেষ আর কিছু বললো না। জানে ঝরণা তাকে ভালবাসে।

ঝরণাই আবার বললো,

—আমি তো স্বাধীন নই। হলে এ অভিনয় করতাম না। আমাকে কনট্রাক্ট করিয়ে নিয়েছে। আমার বুড়ি দিদিমার কাছ থেকে এনেছে আমাকে। খেতে পেতাম না—দিন চলতো না। এখানে খাচ্ছি—গান শিখছি—কিন্তু দলের হুকুমমত চলতেই হবে আমায়।

—তোমার সেই দিদিমা।

—নেই—সে বুড়ি গঙ্গালাভ করেছে। কে জানে অভিনয় কি করে করবো।

—অভিনয়ের ব্যাপারে অতখানা মন খারাপ করছো কেন ঝরণা?

—অভিনয় সত্যি হয়ে যায় অনেক সময়।

—হয় তো কি হবে। প্রবীরদা তো ভালই পাত্র। বিয়ে করে নেবে।

—খবরদার অনিদা—ফের ওকথা বলো তো তোমার মুখ দেখবো না।

চলে গেল ঝরণা। একথা আবার বললে ঝরণা অনিমেষের মুখে দেখবে না। মুখ দেখা ব্যাপারটা এমনি মূল্যবান, কিন্তু সে এ কথা বলে গেল—তার মুখ তো কখনো দেখেনি অনিমেষ। এ জীবনে কখনো দেখবে না। হায় ভববান—এতো দিয়েও কিছুই যে দিলে না।

আর্ত্ততায় মলিন হয়ে উঠলো অনিমেষ। অন্ধ সে—কিছুই কখনো দেখেনি—আর সবাই দেখে—কি দেখে কে জানে। দেখার মূল্য কতখানা কেমন করে জানবে অনিমেষ! তার জীবনের বিনিময়েও যদি সে একবার ঝরণার মুখখানা দেখতে পেত! সে হয় না—হয় না। হাহাকার করে উঠলো সারা অন্তর তার।

॥ আট ॥

ওদের রিহার্সেল চলছে। অনিমেষকে পার্ট মুখস্থ করানোর দায়িত্ব নিয়েছেন হারাণবাবু—এবং মলয়। সে শনি-রবিবার তো যায়ই ছুটির দিনেও যায় এবং অনিকে পার্ট মুখস্থ করতে সাহায্য করে। স্মৃতিশক্তি প্রখর অনির—তাই খুব দেরী হোল না—এই সঙ্গে অভিনয়ও শেখানো হচ্ছে তাকে। ভালই শিখছে অনি। ঝরণার সঙ্গে দ্বন্দ্ব এবং প্রেমের অভিব্যক্তি ভালই ফুটছে তার মুখে আচারে-ব্যবহারে। দু'একটা চমৎকার আর্টও দেখাল সে।

সবাই বললো,

—বাঃ—সুন্দর!

জোর রিহার্সেল চলছে। প্রবীর নায়ক – যদিও অনিমেষই গল্পর নায়ক শুধু এই গল্পটা প্রবীরই নাট্যকারকে দিয়ে লিখিছে। সুতরাং তার পার্টটা যাকে বলে "অথর ব্যাকিং" পার্ট। অনেক কথা—অনেক কথা অনেক ব্যাপার তাকে করতে হয়। অভিনয়ে তার সুযোগ বেশী—নিজে নায়িকা নিবেদিতার সঙ্গে প্রেমাভিনয়ে।

ঝরণাকে অনিচ্ছাস্বত্বেও এই প্রেমাভিনয় করতে হয়। তবে সে ভাল অভিনেত্রী—ঠিকই করে—যদিও তার মনপ্রাণ সাড়া দেয় না। মাঝে মাঝে নাট্যপরিচালকের ধমক খেতে হয়—গ্রাহ্য করে না ঝরণা। বলে,

—যথাসাধ্য করছি—আর কি করতে পারি?

ঝরণাকে এই ফাঁদে ফেলে প্রবীর বেশ জব্দ করেছে। মনে মনে সে খুব আত্মপ্রসাদ লাভ করছে এবং ভাবছে, এই অভিনয়ের মাধ্যমে হয়ত সে ঝরণার সত্যিকার ভালবাসা পেতেও পারে। এতকাল তো

ঝরণা তাকে ভালই বেসেছিল হঠাৎ ঐ অন্ধ অনিমেষের আবির্ভাবে তার জীবন থেকে ঝরণাকে যেন সরিয়ে নিচ্ছে। কী আছে ঐ অন্ধ ছোকরার যার জন্য ঝরণা অমন করে ওকে জড়িয়ে ধরতে চায়? চেহারা ভাল, কিন্তু যে অন্ধ তার চেহারার মূল্য কি? ভাল গলা—তা ভাল গলা বহু ব্যক্তির আছে। তার জন্য ঝরণার মত এক সুন্দরী তরুণীর ভালবাসা কেন সে পাবে। এ যেন প্রবীর সইতে পারছে না। অভিনয়ের মাধ্যমে অনিমেষকে যতটা সম্ভব তুচ্ছ করে তোলবার চেষ্টা সে করিয়েছে নাট্যকারকে দিয়ে এবং নিজেও অভিনয়ে সে চেষ্টা কম করে না।

নাটকটা যদি সাফল্য লাভ করে তো অনিমেষের মাইনে বেড়ে যাবে এবং প্রমাণ হবে যে অন্ধ হলেও অনিমেষ অভিনয় করতে পারবে। তাছাড়া তার গান তো সকলেরই প্রিয়। ইতিমধ্যে অনিমেষ অনেক-গুলি ভাল গান গাইতে শিখেছে—গলার জন্য হয়তো অবিলম্বে তার গান রেকর্ড করা হবে—হয়তো সিনেমাতেও যাবে তার গলা। কিন্তু এখানে প্রবীর নিরুপায়। সুকণ্ঠ ঈশ্বরের দান, সেটা তো চেষ্টা করে হয় না।

শ্রাবণ মাস নাগাদ কলকাতাতেই একটা বায়না হোল এই দলের। ঝুলন-যাত্রায় যাত্রাগান হবে মধ্য কলকাতার এক ধনীর বাড়ীতে। অধিকারী রমেশবাবু এইখানেই নতুন পালাটা সুরু করবেন ঠিক করলেন। জোর মহড়া চললো আগের কয়েকদিন। যথাদিনে গান আরম্ভ হোল।

শুনলো সকলেই। এই নাটকের নাট্যকার শক্তিমান ও চতুর ব্যক্তি, তাছাড়া তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও আছে। তিনি গোড়া থেকেই গল্পের ছক রচয়িতা প্রবীরের মনস্তত্ত্বটা যেন বুঝে ফেলেছিলেন, তাই কথোপথনের অংশে যদিও প্রবীরের প্রাধান্য দিয়েছেন—প্রেমের অভিব্যক্তি অবকাশ দিয়েছেন, তথাপি অনিমেষের অভিনয়ে অতি স্বল্প—

পরিসরের সংলাপে অতি সুন্দর প্রেমমাধুর্য্যতার সঙ্গে আত্মত্যাগের অভিব্যক্তিত্বে অতিশয় সুস্পষ্ট আকার দিয়েছেন। অনিমেষ অন্ধ, তাই দর্শকের সহানুভূতি সব সময়ই আকর্ষণ করে। সেইজন্য প্রবীর যতই ভাল অভিনেতা হোক—শেষ দৃশ্যে অনিমেষের আত্মত্যাগ এবং শেষ গানে তার আত্মবিলোপ দর্শকদের মনকে অতিমাত্রায় অভিভূত করে দিল। তার নামে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। নাটকটা সত্যি সার্থক হয়ে উঠলো।

প্রথম অভিনয়ের প্রথম রাত্রিতেই অনিমেষ এতখানা সাফল্য লাভ করবে, তা ভাবেনি। তার মধুর কণ্ঠ অনেককে এখন নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করেছে যে অনেকেই এসে তার সঙ্গে আলাপ করে গেল।

কেউ কেউ মালা দিল তার গলায়। অবশ্য প্রবীরের অভিনয়ও ভাল হয়েছে—সে ইচ্ছে করেই ভিলেন হয়েছে এই গল্পে—সুতরাং সেও পেল তার যোগ্য সম্মান এবং পুরস্কার। ঝরণার অভিনয় তত ভাল হয়নি।

অধিকারী বললেন,

—এতখানা খারাপ করবি—বুঝতে পারিনি।

—এ রকম দুশ্চরিত্র অভিনয় আমি করতে পারবো না বলেছিলাম।

—চরিত্রের বড়াই করিসনে—হারামজাদী কাঁহাকা—যা করতে বলা হবে তাই করবি!

—না করতে পারলে কি করব?

—চাবুক খাবি। তুই ইচ্ছে করে অভিনয় খারাপ করেছিস। মতলব কি তোর?

—মতলব কিছু নেই। আমি ঐ নিবেদিতার পার্ট করবো না।

—করবিনে?

—না—আমাকে অন্য পার্ট দেওয়া হোক—ওটা আমার ভাল লাগে না।

—তোকে তোর খুশী মত পার্ট দিতে হবে নাকি?

—না—আমি যা পারবো তাই দিতে বলছি।

—আচ্ছা—দেখা যাবে।

অধিকারী এবং হারাণবাবু দু'জনেই চটেছেন ঝরণার উপর।

ঝরণা কিন্তু গ্রাহ্য করলো না।

এই ক'মাস কুড়ি টাকা হিসাবে অনিমেষের বাবা ঘোষাল মশাইকে পাঠান হয়েছে। এই মাসে অধিকারী মশাই ত্রিশ টাকা পাঠালেন। চিঠিতে লিখলেন,

"অনিমেষ ভাল আছে। গানেও উন্নতি করছে। হয়তো আগামী বছরে তার মাহিনা বাড়বে। তবে সুখবর জানানো হোল—অনিমেষ অভিনয়েও ভাল নাম করতে পারবে। আগামী আশ্বিন মাসে পূজার সময় ঘোষালমশাইকে পঞ্চাশ টাকা পাঠান হবে। এটা পূজার বিশেষ খরচ—এ ছাড়া এখন থেকে মাসে ত্রিশ টাকাই দেওয়া হবে।

খবরটা এবং টাকা পেয়ে অনিমেষের বাবা এতই খুশীই হলেন যে তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে দীর্ঘ এক পত্র লিখে পাঠালেন অধিকারী মশাইকে। লিখলেন,

অনিমেষের সব ভার অধিকারী মশায়ের উপর দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। অনিমেষকে মানুষ করার দায়িত্ব যখন নিজেই নিয়েছেন অধিকারী মশাই—তখন তিনিই অনিমেষের পিতৃতুল্য। তার জন্য যা কিছু করা দরকার অধিকারী মশাই করবেন।

অধিকারী মশাই অনিমেষকে ঠিকানা পড়ে শোনালেন। বললেন,

—তোমার বাবা টাকা পেলেই খুশী। কি বল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—অভাবের সংসার, ঠিকমত চালাতে পারেন না।

—হ্যাঁ—তুমি চেষ্টা করে আরো একটু উন্নতি কর। আরো ভাল করে শেখ—রোজগার ভালই হবে—তবে আমার ইচ্ছে—সবটা তোমার বাবাকে না পাঠিয়ে কিছু তোমার নামে পোষ্ট অফিসে জমা রাখি।

—আপনি যা ভাল বোঝেন করবেন।

খুশী হলেন রমেশবাবু অনিমেষের কথায়। প্রতি মাসে কিছু টাকা তা যতই কম হোক—অনিমেষের নামে তিনি জমা রাখবেন।

ঐ টাকা তার ভবিষ্যতের জন্য থাকবে। সবটা তিনি ওর বাবাকে পাঠাবেন না, কারণ—তিনি জেনে এসেছেন, অনিমেষকে দিয়ে টাকা রোজগার করানো ছাড়া তাঁর বা তার স্ত্রীর আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। টাকা অবশ্য তাঁরা পাবেন, কিন্তু অন্ধ অনিমেষের দিকটাও দেখতে হবে। বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন রমেশবাবু একথা ভাবলেন এবং সেইমত ব্যবস্থাও করলেন। কিছু করে জমা পড়তে লাগলো অনির একাউণ্টে।

এদিকে নতুন এই পালাটার সুনাম হয়েছে। কয়েকটা যায়গা থেকেই বায়না এল। পূজার পর দল বাইরে বেরিয়ে যাবে—হয়তো পূজার আগেই যাবে—তাই রমেশবাবু এই বায়না ধরলেন। মাস দুই-এর মধ্যেই পাঁচ-সাত যায়গায় যাত্রাভিনয় হয়ে গেল। সর্ব্বত্র সুনাম অনিমেষের। অন্ধ গায়ক অনিমেষ অন্ধ অভিনেতাও—জোর বিজ্ঞাপন চলছে।

ঝরণা অভিনয় করে নিবেদিতার ভূমিকায়। করে ভালই, তবে অন্য বইএ সে যেমন করে এটাতে তা করতে পারে না। তাই রমেশ-বাবু পার্ট বদলে মীরাকে নিলেন নিবেদিতার পার্ট। মীরা ভালই অভিনয় করছে। ঝরণাকে সখীর ভূমিকায় লাগান হোল। সখী হয়ে ঝরণার আনন্দ ধরে না। অনিমেষকে বললো,

—আমি সখী সাজবো।

—নেমে গেলে। নায়িকা থেকে সখী।

—তা হোক—আমি যা তাই হতে চাই। হয়েছি।

—তোমার ভাল লেগেছে?

—হ্যাঁ—খুব। দেখবে ঐ একটুখানি অভিনয়ই আমি খুব ভাল করবো।

—আচ্ছা—তোমার ভাল হলেই আমি খুশী।

—ভাল হবেই। 'আমি দ্বিচারিণী সাজতে পারবো না। ও আমার ধাতে সইবে না। আমি যাকে ভালবাসবো তাকেই বিয়ে করবো—না পাই করবো না।

—বিয়েই করবে না?

—না।

—আচ্ছা ঝরণা—এখানে এইসব আমাদের কি বিয়েও হয়?

—হবে না কেন? করবে নাকি তুমি?

—আমাকে কে বিয়ে করবে? আমি অন্ধ।

—যদি কেউ করে—এমন হতেও তো পারে, কেউ হয়ত করতে চায়।

—তার জীবন খুব দুঃখময় হবে ঝরণা।

—হোক—তবু যদি কেউ দুঃখটাই সুখ বলে নিতে চায়?

—চায় তো সে নেবে?

—তোমার আপত্তি হবে না?

—না—আমি এমন কাউকে পেলে তো ধন্য হয়ে যাব।

—পাবে—আমি ভগবানকে ডাকবো তার জন্য।

ঝরণা চলে গেল। তার চলে যাওয়ার পায়ের শব্দ শুনলো অনিমেষ। ভাবতে লাগলো—ঝরণা তার নিজের কথাই বলে গেল।

কিন্তু না—ঝরণার জীবন একটা অন্ধের সঙ্গে বাঁধা কখনো উচিত হবে না। তার চেয়ে প্রবীর ওকে গ্রহণ করুক।

সুখী হোক ঝরণা—অনিমেষ ঐকান্তিক কামনা জানালো ঈশ্বরের কাছে।

কে জানে কি আছে ভবিষ্যতের গর্ভে।

॥ নয় ॥

প্রথম দিনেই যে সাফল্য অর্জন করেছিল এই নির্ঝর নাট্য বীথি, তা শুধু বজায় থাকলো বললে যথেষ্ট বলা হয় না—খুব বেশী নাম করলো এই অন্ধ নায়কের নাটকটাতে। নাট্যকার অতি সাধারণ এই গল্পকে অসাধারণ নাট্যরূপ দিয়েছেন এবং অন্ধ অনিমেষ তার অভিনয়ে আশ্চর্য্য সফলতায় তাকে রূপদান করেছে। অন্ধ অনিমেষের নাম ছড়িয়ে পড়লো সহরে।

অধিকারী রমেশবাবু এই সাফল্যে গর্বিত—তাঁর নির্বাচনে যে ভুল হয় নি'-সেইটা তিনি সকলের কাছে সগর্বে বলে বেড়ান। অনিমেষ শোনে, তার নাম-যশ ক্রমশ বাড়ছে-অবশ্য মাহিনার সঙ্গে খাতিরও বেড়েছে এবং পোষাক-পরিচ্ছদও ভাল হয়েছে।

লেখাপড়া জানে না অনিমেষ, কিন্তু ভাষা এবং অন্ধ সম্বন্ধে বেশ কিছু জ্ঞান তার আছে—ঝরণা সে জ্ঞান বাড়িয়ে দিয়েছে। স্বাভাবিক ক্ষমতাবলে অনিমেষ অনেক ব্যাপার বুঝতে পারে। গল্প বিষয়ে তার জ্ঞান যথেষ্ট বেড়েছে। গানবাজনাও শিখছে ভালই।

আশ্বিন মাসে দল বাইরে বেরুলো। এবার তাদের অনেকগুলি যায়গায় ঘুরতে হবে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম হয়ে ওরা যাবে ধানবাদ-ঝরিয়া থেকে হাজারিবাগ পর্য্যন্ত। গয়াও যাবার কথা আছে-হয়তো বেনারস যেতে হতে পারে।

দলে সাজ সাজ রব। নতুন পোষাক এবং সরঞ্জামও কিছু কেনা হোল। ভাল দিন দেখে যাত্রাদল হাওড়ায় এসে গাড়ীতে চড়লো-অনিমেষ চলেছে সঙ্গে!

—রূপনারায়ণ নদী-বাব্বা! কী জলের তোড়!

ঝরণা বললো কথাটা। অনিমেষ শুনছে—নদী কেমন সে জানে না। বর্ণনা শুনেও ঠিকমত বুঝতে পারে না—তবু ঝরণা বর্ণনা করলো নদীর। পথের আরো অনেক বস্তুর বর্ণনাই করলো সে। শুনলো অনিমেষ—প্রবীর একটু দূরে আছে—বললো,

—ওকে ওসব বলে লাভ কি? ও কি বুঝতে পারবে?

—হ্যাঁ—কিছুটা আইডিয়া হবে নিশ্চয়।

—না—জন্মান্ধর কোন আইডিয়া হয় না।

—না হোক - আমি বলবো। তোমার তাতে কি!

রাগে প্রবীরের মুখ লাল হয়ে উঠলো। কিন্তু সে আর কিছু বললো না।

গাড়ী মেদিনীপুরে পৌঁছাল। সবাই নামলো। অনিমেষকে নামালো ঝরণা।

অনিমেষের হাত ধরে যেতে তার ভাল লাগে। কেন লাগে সে জানে না। মনে হয় সেও তো একটা পথে পড়া মেয়ে। অনিমেষের মতই তার অবস্থা। তার কেউ কোথাও নেই—অনিমেষের মা-বাপ থেকেও না থাকা।

অনিমেষের উপর কেমন যেন আশ্চর্য্য করুণা জাগে ঝরণার অন্তরে।

যাত্রা আরম্ভ হোল। এবার নায়িকা মীরা—ঝরণা তার সখী অর্থাৎ ঝি।

অনিমেষ নায়ক হলেও নায়কের কাজ বেশীর ভাগ প্রবীরের। বক্তৃতা তারই বেশী এবং অভিনয় তাকেই বেশী করতে হয়। যাত্রা চলছে।

নায়িকা নিবেদিতার সঙ্গে নায়ক সুখেন্দুর কয়েকটা কথা কাটাকাটির দৃশ্য এবং তারপর প্রতিনায়কের সঙ্গে নায়িকার রাশিয়ান ড্যান্স দেখতে চলে যাওয়ার পর নায়ক সুখেন্দুর গৃহত্যাগ দৃশ্যটিকে অনিমেষ এমন

আশ্চর্য্য রূপদান করলো যে ঐ অন্ধ অভিনেতার উপর রসগ্রাহী দর্শক-সাধারণের সহানুভূতি—সমবেদনা অজস্র ধারায় ঝরে পড়লো। সকলেই বললো,

– এই যুবক একটি আশ্চর্য্য ক্ষমতাসম্পন্ন অভিনেতা।

– আচ্ছা—ওর যদি চোখ থাকতো ?

—আঃ কী গলা—যেন কিন্নর গাইছে।

প্রশংসায় সহস্রমুখ হয়ে উঠলো দর্শকসভা। অধিকারী রমেশবাবু সানন্দে সকলকে বললেন,

—অনিমেষকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছি—ঐ রত্ন এখন আপনাদের।

প্রবীর শুনলো এই প্রশংসাবাণী। রাগে দুঃখে সে অভিভূত হয়ে পড়েছে। অনিমেষকে ছোট করার জন্যই সে এই গল্প ফেঁদেছে এবং নাট্যকারকে দিয়ে লিখিয়েছে কিন্তু ফল হোল উল্টো। অনিমেষই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলে সম্মান পাচ্ছে। ঝরণাকে আর আয়ত্তে রাখা গেল না। হিংসায় জ্বলে যাচ্ছে প্রবীর। কিন্তু নিজের জালে নিজেই সে বন্দী। কোনো উপায় সে করতে পারে না। ঐ পালাটাই বেশী চলছে। ঐটারই সপ্রশংস আলোচনা সর্ব্বত্র।

প্রবীর অসহায় হয়ে পড়লো। অভিনয় তাকে করতেই হয় এবং সে অভিনয় ভাল না হলে অধিকারী রমেশবাবু রক্ষে রাখবেন না। তাছাড়া যতটা সুনাম তার আছে এখান তাও নষ্ট হয়ে যাবে। করে কি সে এখন।

ঝরণা দিনে দিনে তার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। তাকে পাওয়া যাবে না।

প্রবীরের ইচ্ছা, ঝরণাকে বিয়ে করবে। ঝরণাকে সে ভালবাসে কিন্তু ঝরণা তো চলেই গেল। ঐ অন্ধটাকে নিয়েই সে হয়ত জীবন পথে পাড়ি দেবে। সম্বল শুধু অভিনয় আর গান। কিন্তু অনিমেষের গান অপরূপ, অবিলম্বে রেকর্ড হবার সম্ভাবনা এবং হয়তো সিনেমাতেও

ডাক পড়বে—বেতারে ঢুকবার সুযোগ পাবে সে। টাকা রোজগারের পথ তো তার খোলাই। তবু সে অন্ধ তার সব থেকেও নাটকের ঐ নায়কের মতই কিছুই যেই। কিন্তু এখানে অনিমেষের ঝরণা আছে —সবই আছে তাহলে। নাটকে যেটা নেই বাস্তবে তাই আছে। প্রবীর ভাবে এইসব কথা।

অনিমেষ গ্রামে থাকতে কবিগান শুনতো। ওদেরই ভাঙা বাড়ীর ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপের সামনে যেখানে আগের দিনে যাত্রাকথি হোত সেখানেই আজো যাত্রা কবিগান হয়। কারণ গ্রামের মধ্যে ঐ জায়গাটা বেশ প্রশস্ত। অনিমেষ তার ঘরে বসেই শুনতে পেত। কবিগান খুব ভাল লাগে তার। রামায়ণ-মহাভারতের গল্পগুলোও সে শুনে নিয়েছে বন্ধুদের মুখে। বিশেষ মলয় তাকে ভাল করে সব শুনিয়েছে। সে সব মুখস্থ অনিমেষের।

কয়েকদিন ধরে অনিমেষ ভাবছে—কবিগানের মত করে একটা বাদাবাদি তরজার মত নাটক লিখলে কেমন হয়। পরিকল্পনাটা সে বললো ঝরণাকে গোপনে। ঝরণা শুনেই খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলো,

—বলবে তুমি—আমি লিখে যাব।

—পারবে?

—হ্যাঁ—না পারার কি আছে। আমি তো ভালই লিখতে পারি।

—বেশ—তাহলে গল্পটা ঠিক করা যাক।

দুজনে পরামর্শ করে ঠিক করলো—সত্যযুগ আর কলিযুগ নিয়ে একটা কবিগানের পালা রচনা করবে। সত্যযুগের ধর্ম্মকর্ম্ম যাগযজ্ঞ এবং ঋষি-মুনির আদর্শ—রাজ্যশাসন—রীতিনীতি—সতীধর্ম্ম এবং মানবধর্ম্ম নিয়েই হবে সত্যযুগ—আর কলিযুগ বর্তমানের বিজ্ঞানভিত্তিক সভ্যতা—সংস্কার—মুক্তির নানা প্রচেষ্টা—যানবাহন থেকে যুদ্ধবিগ্রহ ও রীতিনীতির মধ্যে মানুষের একটা ভীষণ পরিণতির পথে যাত্রা—এই নিয়েই

হবে গল্প। কিন্তু এতে কোনো গল্প নেই—শুধুই কথার ঝগড়া—তাই ঝরণা বললো,

—গল্প তো নেই—একটা গল্প তৈরী করলে ভাল হয়।

অনিমেষ ভাবতে লাগলো। শেষে গল্পই একটা খাড়া করলো সে। অতীত যুগের এক খ্যাতনামা রাজার সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের এক রাজনীতিক প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হোল স্বর্গের এক উদ্যানে—সেই-খানেই গল্পের সুরু। অর্থাৎ গল্পটা স্বপ্নদৃষ্ট একটা চিত্র—অতীতের পাত্রপাত্রী আসছে পায়ে হেঁটে—ঘোড়ায় বা হাতীতে চড়ে অথবা নৌকায়। আর বর্ত্তমানের সব আসছে মোটরে—ট্রেনে—ষ্টিমারে—রেলে—প্লেনে—স্পুটনিকে। অতীতের কাছে বর্ত্তমানে এমন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠলো যে বেচারা অতীত শেষ পর্য্যন্ত কী করবে ঠিক করতে না পেরে রাজমহিষীকে প্রশ্ন করলো,

—কি করা যায়?

—চল আমরা আবার এই বর্ত্তমান যুগেই জন্মাই। এইসব রেডিও-টেলিফোন—টেলিভিশান—ভোগ করি—প্লেনে—রকেটে চড়ে সৌরমণ্ডল প্রদক্ষিণ করি—এ এক বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করেছে বর্ত্তমান যুগ।

অতীত একটু ভেবে বললো,

—তোমার কথা খুবই লোভনীয়—কিন্তু···

—কিন্তু কি আবার? চল—আমরা যাই—

—কিন্তু বর্ত্তমানের এ্যাটম্ ব্যোমকে আমার বড় ভয়।

—ভয় কি! মরলে আবার তো এখানেই চলে আসবো।

—তা কে জানে। অতীতে আমরা অনেক দানপুণ্য করেছি। তারই ফলে স্বর্গবাস করছি। এবার গিয়ে তো সে সব করা হবে না। কারণ এখন আর ও সবের চলন নেই। এখন জীবন শুধু ভোগের ব্যাপার। ত্যাগ বলে—পরার্থপরতা বলে কিছু নেই—কে জানে এবার গিয়ে মৃত্যুর পরে কোথায় যেতে হবে।

—তাহলে কি করবে ?

—কিছু না। আমাদের কাজ আমরা করে এসেছি। ওদের কাজ ওরা করুক—আমরা যেমন আছি থাকবো।

—কিন্তু আমার বড় সাধ জাগছে ঐ রকম করে প্লেনে চড়ে বেড়াতে।

বর্ত্তমান এমন সময় এসে বললো,

—তার উপায় তো আমরা করেছি।

—কি ? মহিষী সাগ্রহ প্রশ্ন করলেন।

—ওঁর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করে আমার সঙ্গে চলে আসুন—আমার প্লেন তো আছেই—রকেটও থাকবে। তবে মহিষীর পদ আর নেই এখন মিসেস।

—না, তাহলে যাওয়া হবে না। আমি চিরকালের মহিষী—তাই থাকতে চাই।

—প্রেসিডেণ্টের পত্নীর সম্মান কম নয়। তাছাড়া আপনার ব্যক্তিগত জীবনস্বত্ত্বাও সেখানে পাবেন। নিজেই পৃথিবী—বরেণ্য হতে পারবেন।

—তাই নাকি! তাহলে তো খুবই আনন্দের কথা। অতীত যুগ যতই ভাল থাক আমাদের নারীজাতিকে বড্ড অবহেলা করেছে।

—সেদিন আর নেই।

—তাহলে চলুন—বলে প্রাক্তন রাজাকে বললেন—ওগো আমি চললাম।

সত্যযুগের রাজা স্বর্গের মহুয়া তরু তলে দাঁড়িয়ে ডাকলেন,

—উর্ব্বশী !

—আদেশ করুন মহারাজ !

—একটা গান শোনাও। গান আরম্ভ হোল তার সঙ্গে অমৃত অর্থাৎ সুরা।

॥ দশ ॥

সেকালের ধর্ম্ম—সমাজনীতি—রাজনীতি ও আনুষঙ্গিক আচার-আচরণকে অবলম্বন করে এই কবিগানের ছড়ার মাধ্যমে নাটকটি রচনা করা হোল কয়েক মাস ধরে। রচয়িতা অনিমেষ আর অনুলেখিকা ঝরণা। ঝরণাও যথেষ্ট সাহায্য করেছে অনিকে। তবে কবি-গানের ছন্দ—তাল—মান আর ধূয়া অনিমেষের খুব ভাল জানা আছে। তাই অধিকাংশই ছড়াই তার রচনা। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ—রঙ্গ-রসিকতায় ভরা নাটকটি আদ্যোপান্ত নিজেরা শুনে ঠিক করলো অধিকারীকে শোনাবে।

যাত্রাদল নানা যায়গা ঘুরে এখন আছে হাজারীবাগে। এখান থেকে গয়া হয়ে বেনারস যাবে—তারপর ওরা ফিরবে কলকাতায়। ঝরণা বললে,

—কলকাতায় গিয়ে নতুন নাটকের চাহিদা যখন হবে তখন দেখানো হবে।

—হ্যাঁ—সেই ভাল! এর মধ্যে যদি আরো কিছু যোগ করা দরকার হয় তো করা হোক।

দলের সুনাম খুব। এবার ভাল অর্থ উপার্জন করেছে ওরা।

ফিরতি পথে একটা বায়না আছে বর্দ্ধমানে। গেয়ে যেতে হবে। পরদিনই বর্দ্ধমান এসে পড়লো। ষ্টেশনে নেমে অধিকারী মশাই বললেন সকলকে,

—আজ বিশ্রাম। আজ গান হবে না। বায়না কাল। আমরা একদিন আগে এসেছি।

—বেশ—তাহলে আজ আমরা বর্দ্ধমায সহর দেখে বেড়াব।

—হ্যাঁ—তোমাদের যেমন ইচ্ছে।

বাসায় পৌঁছে জলযোগ সেরে অনেকেই বেরিয়ে পড়লেন বর্দ্ধমান দেখতে। দেখবার জিনিষ অনেক ছিল—বর্দ্ধমানে তার এখনো কিছু কিছু আছে।

সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির বড় বড় পুষ্করিণী এবং ছায়া নিবিড় রাজপথ সত্যি দেখবার মত। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের দেশ এই বর্দ্ধমান। খুব ভাল লাগল।

নিজের চোখে দেখা জিনিষের গল্প করতে সকলেরই ভাল লাগে। সবাই বাসায় ফিরে গল্প করতে আরম্ভ করলো বর্দ্ধমান সম্বন্ধে। অন্ধ অনিমেষ শুনছে। দেশের বর্ণনা ওরা করে—চুপ করে শোনে অনিমেষ। শুনে শুনে ওর কেমন একটা অদ্ভুত ধারণা জন্মেছে দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে। হয়তো বাস্তবের সঙ্গে তার কিছুমাত্র মিল নেই—সবটাই ওর কল্পনায় গড়া—কিন্তু তাতেই সে তৃপ্ত থাকে। আজ কিন্তু তৃপ্ত হতে পারলো না। কারণ এই বর্দ্ধমান সহরের পথঘাট—বড় বড় সায়র—রাজবাঁধ এবং রাজবাড়ীর গল্প—বিদ্যাসুন্দরের গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে প্রবীর এমন সুন্দর করে বর্ণনা করতে লাগলো যে সে যেন অনিমেষকে বুঝিয়ে দিতে চায়—অনিমেষ অন্ধ—সুতরাং সব থেকেও তার কিছুই নেই।

ঝরণাও দেখে এসেছে—সেও ছিল গল্পের আসরে। প্রবীর চলে যাওয়ার পর ঝরণা ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললো,

—ওসব কথা বিস্তর বাড়িয়ে বলেছে প্রবীরদা। তুমি দুঃখ করো না। চোখে না দেখলেও তুমি তোমার কল্পনায় যা দেখ—তার মূল্য কিছু কম নয়। প্রবীরদা হিংসায় জ্বলে মরছে।

—কেন? আমি তার কি ক্ষতি করেছি ঝরণা?

—তুমি কেন করবে—করেছি আমি। আমি তোমাকে আদর করি—ভালবাসি এটা ওর সহ্য হয় না। ও চায়—আমি তোমাকে হেনস্থা করি।

—অন্ধের উপর অকারণ এই বিদ্বেষ ?

—অকারণ নয়—প্রবীরদা চায় আমি তাকে বিয়ে করি।

—ও—তাই নাকি ! খুব তো ভালকথা ঝরণা।

—না—ভাল কিছু কথা নয়। ওকে বিয়ে কেন করবো আমি !

—প্রবীরদা তো ভালই পাত্র।

—তোমার মুণ্ডু।

ঝরণা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। ঝরণা বলল,

—খাবার ডাক হোল—তোমার খাবারটা এনে দিই।

চলে গেল ঝরণা। মার মত বোনের মত—পরম প্রেমিকার মত ঝরণা সেবা করে অনিমেষের। ওর সেবায় কোনো ফাঁক নেই। ঝরণা যদি এখানে না থাকতো অনিমেষ কি করে দিন কাটাতো কে জানে।

মিনিট কয়েক পরেই ঝরণা নিয়ে এল অনির খাবার। খাওয়ালো—থালাবাটি সব তুলে নিয়ে গেল। এসব কাজ ওর নিত্যকার কাজ।

সকলেই জানে—ঝরণা খুব সেবা করে অনিমেষের। অন্ধ অনিমেষের জন্য সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ করে—প্রবীরও মুখে কিছু কম করে না। কিন্তু অন্তর তার জ্বলছে। ঝরণা ক্রমাগত অনিমেষের প্রতি ঢলে পড়ছে। প্রবীর অত্যন্ত মুষড়ে পড়ছে।

পরদিন বর্দ্ধমানে যাত্রাগান হোল—ওখানকার কাজ শেষ করে দল এল কলকাতায়। এখন নতুন একটা পালা ধরতে হবে। নতুন পালা না সাধলে দলের সুনাম থাকে না।

অধিকারী রমেশবাবু নতুন নাটকের চেষ্টা করছেন। ঝরণা বলল,

—অনিদা একটা নাটক লিখেছে।

—অনিদা—মানে অনিমেষ ?

—হ্যাঁ।

—সেকি! কি করে লিখলো সে?

—লিখেছি আমি—অনিদা মুখে বলে গেছে। আপনি শুনতে পারেন।

—আচ্ছা—আজই সন্ধ্যায় শোনাবে।

সব ঠিক হোল। সন্ধ্যায় নাটকটা শোনান হবে—ঝরণা পড়ছে। প্রবীর অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে শুনতে বসলো। সকলেই আশ্চর্য্য।

ঝরণা পড়ে চলেছে—গানগুলোতে সুরও দিয়ে যাচ্ছে। কবি-গানের ছড়া ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের একটি রূপচিত্র এবং আধুনিক সভ্য ভারতের একটি রূপচিত্র আঁকা হয়েছে।

প্রাচীনকালের রাজারাণী—রাজকন্যা—পাত্রমিত্র ইত্যাদির সঙ্গে বর্ত্তমান কালের গণতন্ত্রী-সমাজতন্ত্রী—সকল রকম শাসক-শোষক—ধনী-নির্ধন—বৈজ্ঞানিক-ইঞ্জিনীয়ার—বিপ্লবী-শান্তিবাদী ইত্যাদির সাক্ষাৎ ঘটিয়ে একটি নতুন ঢংএর নাটক রচনা করা হয়েছে। পুরাতন যুগ নতুনকে এবং নতুন যুগ পুরাতনকে ছোট করবার জন্য এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে সব নাটকটার মধ্যে। কে বড়, কে ছোট এই নিয়েই নাটক। সমাধান কিছু নেই—সে যুগে যা ছিল—তা সে যুগের ভাল ছিল—এ যুগে যা আছে তাকে মেনে নিতেই হবে—কারণ মানুষ বা মানুষের সমাজ গতিশীল সে থেমে থাকে না। এই রূপক নাট্যটি একটি মনোমত পরিবেশে রঙ্গব্যঙ্গ সহ রচিত হয়েছে।

শুনে সকলের ভাল লাগলো।

দলের নাট্যকার বললেন,

—আইডিয়াটা নতুন—অভিনয়ে কেমন দাঁড়াবে কে জানে!

—ভালই দাঁড়াবে—বললেন রমেশবাবু।

কারো আর কোনো কথা চললো না। নতুন নাটকটার মহড়া হবার কথা ঠিক হোল। পাত্রপাত্রী অনেক নাটকে। প্রবীরকে

সেকালের রাজা করা হোল—রাণী হোল মীরা। ঝরণা হোল উর্ব্বশী। মর্ত্ত্যে এসে নাম নিয়েছে বাসবদত্তা। অনিমেষ এক অন্ধ বাউল।

বিজ্ঞানের এই বৈপ্লবিক বিবর্ত্তনের যুগের সঙ্গে প্রাচীন যুগের শান্ত-সমাহিত যুগের একটি তুলনামূলক আখ্যায়িকা—অতি সুন্দর ভাবে—প্রকাশ পেয়েছে এই রূপক নাট্যে। প্রাচীন যুগের যুদ্ধরীতির সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের কামান-মর্টার ট্যাঙ্ক বোমারু ও এ্যাটম বোমের ধ্বংসশীল আবর্ত্তের কথাও বাদ যায়নি। সব শেষে প্রাচীন যুগের রাজরাণীকে বর্ত্তমান যুগের সমাজতন্ত্রী জননায়ক এসে নির্ব্বাসিত করলেন—জনগণের নয়—ঘোষিত হোলা—প্রাচীন যুগের পাথর খুঁড়ে মানুষ এখন শুধু ইতিহাস রচনা করছে অনিমেষের গানে এই কথাই ঘোষিত হোল।

নাটকটা সত্যি ভাল হয়েছে। সকলেই বললেন, অনিমেষের নাট্যরচনার প্রতিভা আছে'। শুনলো অনিমেষ—কিন্তু সে নিজে জানে ঐ নাটকটি রচনার প্রায় সমস্ত কৃতিত্বই ঝরণার। সেই অমন সুন্দর করে গল্পটা সাজিয়েছে—শুধু গান আর কথা অনিমেষের। ওর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং রসাল বাক্যগুলিও অনিমেষের—আর এই জন্যই নাটকটা এত ভাল হয়েছে। মহড়া চললো কয়েকদিন খুব উৎসাহের সঙ্গে। এই নাটকটা যদি সফল হয় তো অনিমেষ নাট্যকার হিসাবে ভালই টাকা পাবে। সে কথাও অধিকারী রমেশবাবু জানিয়ে দিলেন অনিমেষের বাবাকে। অনিমেষ শুনলো—ভাবতে লাগলো—নাটকের পরিক্রমা অনিমেষের হোলেও এর রচনার কৃতিত্ব ঝরণার।

আগের নাটকটা প্রবীরের গল্প নিয়ে রচিত হয়েছিল—তাই ঝরণা আক্রোশ বসে অনির গল্প নিয়ে এই নাটক রচনা করেছে। এটা প্রবীরকে টেক্কা দেওয়া ছাড়া কিছু নয়। তবে নাটকটা অনির নামেই চলছে—চলবে।

ঝরণা যে অনিমেষকে ভালবাসে এ সত্য অনির জনা—কিন্তু সে ভালবাসা যে প্রেম তা ওর জানা ছিল না। অন্ধ অনিমেষকে কে প্রেম

নিবেদন করবে। কিন্তু ঝরণা একদিন নিজেই প্রকাশ করেছিল অনিমেষকে সে ভালবাসে। তখন অনিমেষ তার মূল্য দেয়নি। কথাটা কথার কথা মনে করে অগ্রাহ্য করেছিল। এখন বিশ্বাস করে।

যাত্রাদলের অধিকারীগণ সকলে মিলে ঠিক করেছেন সকল দলই একদিন করে অভিনয় করেবেন তাঁর দলের শ্রেষ্ঠ নাটকটি। দর্শকগণ সব শেষে বিচার করে বলবেন—কোন দলের কোন নাটক শ্রেষ্ঠ!

রমেশ অধিকারী মশাই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিলেন। একটা বড় পার্কে এই অভিনয় হবে। সহরের গুণী-জ্ঞানী এবং সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হোল। নির্দ্দিষ্ট দিন থেকে আরম্ভ হোলো প্রতি-যোগিতা।

রমেশ অধিকারী মশাই ঠিক করলেন—বাইশ বছর বয়সের অন্ধ লেখক অনিমেষের এই নতুন নাটকটাই অভিনয় করবেন।

সকলেই বললেন—এটা কেমন হবে—দর্শকগণ কিভাবে নেবেন কে জানে। অন্য নাটক যা সাফল্য অর্জন করেছে তাই গাওয়া হোক।

—না—রমেশবাবু বললেন—এটাই গাইতে হবে। যদি বিফল হয়তো কি আর হবে—পুরস্কারটা না হয় পাবনা—এই তো। আর আমার বিশ্বাস এই নতুন ঢংএর নাটক নিশ্চয় পছন্দ হবে সকলের।

রমেশবাবুর আত্মবিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ়। তিনি কারো কথা শুনলেন না। যথাদিনে ঐ সেকাল-একালের নাটকটিই গাইলেন। আশ্চর্য্য!

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হাস্যরসের আনন্দ পরিবেশনের মধ্যে একটি সুনিবিড়-ভাব গম্ভীর আদর্শবোধকে জাগ্রত করে তোলা হয়েছে প্রাচীন রাজার চরিত্রে এবং আধুনিক যুগের মধ্যে একটা অশান্ত উগ্র ক্ষুধার্ত্ত যুগসন্ধিকে রূপায়িত করা হয়েছে—আগে চল—আরো—আরো আগে—মূর্ত্তিতে।

তার অফুরন্ত কামনাবহ্নি অনির্ব্বাণ—শান্তি কোথাও নেই—পরি-বর্ত্তনই তার ধর্ম্ম—ভাঙ্গা আর গড়া তার নিত্যকার কাজ—পরীক্ষা আর

নিরীক্ষাই তার জীবনবোধ। এই অস্বাভাবিক জীবনধর্ম্মকে চিত্রিত করা হয়েছে সভ্যতার বর্ত্তমান বেশভূষায়। খুব ভাল লাগলো সকলের।

নাটকটা অসামান্য সাফল্য অর্জন করলো। পুরস্কার পেলেন এই দল।

॥ এগার ॥

প্রথম পুরস্কার পাওয়ার পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন চলতে লাগলো। নাটকটার নতুন আঙ্গিক এবং সাজ-সজ্জার বৈচিত্র্যও যথেষ্ট। তাছাড়া প্রবীর এই নাটকে প্রাণ ঢেলে অভিনয় করেছে। সুনামও কিনেছে প্রচুর তার বিনিময়ে। প্রবীর সত্যি ভাল অভিনেতা। পক্ষান্তরে অনিমেষের বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই এই নাটকে। সে বাউল-বৈষ্ণব—গান করে পথে পথে—রাজনীতি—সমাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতিই তার গানের বাণী। প্রাচীন থেকে নবীন যুগ পর্য্যন্ত তার প্রসার। পাঁচ-সাতখানা গান তাকে গাইতে হয়েছে—কথা অত্যন্ত কম। গানের জন্য সুনাম অক্ষুণ্ণ রইল—কিন্তু অভিনেতার গৌরব একা লাভ করলো প্রবীর। তার জন্য সে পেল অভিনেতার প্রথম পুরস্কার। অধিকারী রমেশবাবু খুশী হয়ে বললেন,

—দলের পক্ষ থেকেও তোমাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। কি চাও বল?

—আমি ঝরণাকে বিয়ে করতে চাই।

—ভাল কথা। কিন্তু এ কথার জবাব তো ঝরণাই দেবে।

—আপনি তার গার্জেন—অভিভাবক আপনিই ব্যবস্থা করবেন।

—আমি ঝরণাকে জানাব তোমার কথা। সে কি বলে তোমাকে বলবো।

—সে আবার কি বলবে? এ বিষয়ে আপনার মতই তো যথেষ্ট।

—আমার অমতের কোনো কারণ নেই। ঝরণার বয়স হয়েছে এবং তোমারও বিয়ে করা দরকার। ভাল—কথাটা ভেবে দেখি।

রমেশবাবু বললেন প্রবীরকে, কিন্তু যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

কারণ যতদূর জানেন—ঝরণা প্রবীরকে চায় না। তার চেয়ে মীরাকে যদি বিয়ে করে প্রবীরের তো ভাল হয়। দেখা যাক—ঝরণা কি বলে! নিজের খাসকামরায় ঝরণাকে ডাকলেন তিনি।

—শোন ঝরণা—তোমাকে মানুষ করলাম—তুমি এই দলের একজন সেরা অভিনেত্রী—এবার আমার ইচ্ছে—তোমার বিয়ে দিই···

ঝরণা আকস্মিক এই প্রস্তাব শুনে চমকিত হয়ে উঠলো। বললো,

—বিয়ে?

—হ্যাঁ—বিয়ে। অমন চমকে উঠলে কেন? তোমার বয়স আঠার হোল।

—হ্যাঁ—কিন্তু বিয়ে আমি করতে চাইনে—অন্ততঃ এখন নয়।

—এই তো সময়। যথাকালে বিয়ে করা উচিৎ। দু'একটা ছেলে মেয়ে হওয়ার পর আর যাতে না হয় তারও ব্যবস্থা করা হবে।

—কোথায়—কার সঙ্গে বিয়ে?

—আমার দলের সেরা অভিনেতা—সুন্দর স্বাস্থ্যবান—সুশিক্ষিত ছেলে প্রবীরের সঙ্গে বিয়ে দেব তোমার।

—না—

ঝরণার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত দৃঢ় শোনাল। রমেশবাবু আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন।

—কেন?

—কারণ জানবার কিছু নেই। বিয়ে আমি করবো না। আমি কুমারী থাকবো।

—চিরজীবন কুমারী থাকা খুব দুঃখের ব্যাপার ঝরণা—ভেবে দেখ।

—দেখেছি—আপনি আর ও আদেশ করবেন না। প্রবীরদা আমার দাদা আছেন—দাদাই থাকবেন।

—সে চায় তোমাকে বিয়ে করে ঘর বাঁধবে।

—জানি—অন্য কাউকে নিয়ে তিনি সেটা করতে পারেন। আমি না।

—তোমার এ আপত্তির কারণ কি ঝরণা?

—আমি তাঁর সঙ্গে ঘর বাঁধতে পারবো না।

—তুমি কথাটা আরো ভাল করে ভেবে আমায় বলবে কেমন? যাও এখন।

ঝরণা প্রণাম করে চলে গেল, কিন্তু তার মুখের চেহারা দেখে রমেশবাবু বুঝলেন—ঝরণা ভাঙবে তো নুইবে না। কেন? কি এর কারণ? জানবার জন্য মীরাকে ডাকলেন তিনি। মীরা এলে বললেন,

—তোমার এবারের অভিনয় খুব ভাল হয়েছে। আমার ইচ্ছে এবার বিয়ে কর।

—বিয়ে? কোথায়?

—তোমার কি কিছু ঠিক আছে?

—আজ্ঞে না। বিয়ের কথা ভাবিনি কোনো দিন। আমাদের আবার বিয়ে কি!

—কেন? আমি তোমাদের মানুষ করেছি—বিয়ে দিয়ে সংসারী করে দিতে চাই। অবশ্য বিয়ে হলেই যে দল ছাড়তে হবে তা বলছিনে —বিয়েটা করা দরকার।

—আপনি যা ভাল বোঝেন করবেন।

- আমার ইচ্ছে—প্রবীরের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিই।

মীরা চুপ করে রইল। রমেশবাবু তার উত্তরের অপেক্ষায় থেকে বললেন,

—তোমার মত কি?

—আমার মতামতের কিছু নেই। আমাকে বিয়ে করতে রাজী হবেন কিনা প্রবীরদাই জানেন।

—রাজি হবে না কেন? তুমি কিন্তু খারাপ মেয়ে নও। দলের জুয়েল।

—ওঁর মতামত জানবেন আপনি। আমাকে যা বলবেন তাই করবো।

—আমি খুব খুশি হলাম। আচ্ছা—যাও এখন।

মীরা চলে গেল। রমেশবাবু দল পরিচালনা করেন। মীরাকে সরাসরি তিনি ঝরণার কথা শুধোলেন না, কিন্তু বুঝলেন—ঝরণার প্রতিই প্রবীর আকৃষ্ট—মীরার প্রতি নয় এবং সেটা মীরার জানা। ভাল, মীরার বিয়ে তিনি দলের অন্য জুয়েল মাধবের সঙ্গে দেবেন। মাধব শুধু সুন্দর অভিনেতাই নয়—সে ভাল বেহালাবাদক। বেহালাই বাজায়—দরকার হলে অভিনয়ও করে। প্রবীর আসার আগে সেই নায়কের ভূমিকায় নামতো। মীরাও তাকে ভালবাসে।

সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে বিজ্ঞাপন পড়েছে দলের। সুতরাং দালালরা এসে পড়ল আগামী মরশুমে যাত্রার বায়না দিতে। অধিকারী রমেশবাবু দাঁও বুঝে দাম কিছু চড়িয়ে দিলেন—কারণ তাঁর দল শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে!

বিস্তর বায়না হয়ে গেল। সবাই চায় ভাল দলের ভাল গান শুনতে।

টাকার জন্য আধুনিক যুগের এসব ব্যাপার আটকায় না। বিশেষতঃ কারখানা এবং কলিয়ারীর দেশে টাকা যেন ছড়ানো রয়েছে এইসব কাজের জন্য। ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমীর মুখেই নির্ঝর নাট্যবীথি বেরিয়ে পড়লো বিহারের দিকে। ওদিকটায় কলিয়ারী এবং কারখানা —তার সঙ্গে অনেক সহরও গড়ে উঠেছে—সেখানেও কম দাম নয় এসব গানের। এ বছর প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ যায়গায় বায়না ধরা হয়েছে—কোথাও দু'দিন কোথাও বা তিনদিন। প্রায় ছমাসের প্রোগ্রাম।

প্রবীর আশা করেছিল—অধিকারীমশাই নিশ্চয় ঝরণাকে রাজি করাবেন। কিন্তু তাঁর তরফ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে সে হতাশ হয়ে একদিন বলে বসলো,

—আমার বিয়ের কথাটার কি হোল ?

—হবে—অধিকারী রমেশবাবু বললেন—এখন ভাদ্র—আশ্বিন কার্ত্তিকে তো হিন্দু বিয়ে হয় না—তা ছাড়া আমার ইচ্ছে—এখন এ বছর যা বায়না পেয়েছি সেগুলো সেরে আসি। ফাল্গুন বা বৈশাখ মাস নাগাদ ব্যবস্থা করবো।

—ঝরণা কি রাজি হয়েছে ?

—না হবার কি আছে। তবে তাকে অবশ্য জিজ্ঞাসা করতে হবে। কিন্তু আমার কি মত জান ? ঝরণা ছোট—তুমি মীরাকে তো বিয়ে করতে পার।

—আজ্ঞে না—তা হয় না। ঝরণাকে না পেলে আমি চলে যাব দল ছেড়ে।

—আমি সাধ্যমত চেষ্টা করবো। তবে বিয়ের ব্যাপারে তো জোর চলে না। তুমি আপাততঃ কিছু দিন থাম।

—যে আজ্ঞে।

বলে প্রবীর চলে গেছিল—কিন্তু সে প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছে। ঝরণা তাকে গ্রহণ করবে না। কী যে এক মোহ পড়েছে তার ঐ অন্ধ অনিমেষের প্রতি—কে জানে। ঐ অন্ধকে নিয়ে কি সে করবে ? কেমন করে কাটাবে জীবন ? গান গেয়ে টাকা হয়তো অনিমেষ অর্জন করতে পারবে ভালই—কিন্তু টাকাই কি সব ? আশ্চর্য মন ঝরণার প্রবীরের সমস্ত আবেদন অগ্রাহ্য করে চলেছে সে।

দল গিয়ে ধানবাদ পৌঁছাল। আগের বছরের সেই বাসায় উঠলো সব। যায়গাটা অত্যন্ত মনোরম—তবে এবার এখন বর্ষা চলছে। তাই সেই সুষমাময় সৌন্দর্য্য এখন নেই—তার বদলে আছে বৃষ্টিধোয়া

সবুজের ঘন সমারোহ—গাছে—পাতায়—ঘাসে—আর রকমারী রংএর প্রজাপতির উড়ন্ত ডানার ফুলঝুরি। দেখছে ঝরণা—দেখছে।

—কি যে সুন্দর লাগছে অনিদা।

—কি?

—প্রজাপতি—নানা রং—নানা রকম—নানা ভাবে উড়ছে সব—কেউ ঘাসে কেউ গাছের পাতায় কেউ বা—ঐ যা—

—কি হোল?

—একটা এসে আমার কপালে বসলো—

—বেশ তো। ওরা বসলে নাকি বিয়ে হয়?

—হয় শুনেছি। হবে হয়তো আমারও। কার সঙ্গে হবে কে জানে।

—তুমি যার সঙ্গে চাইবে।

—তা হয় না অনিদা—তা হবার নয়। আমি যাকে চাইব পৃথিবীর আর কেউ হয়তো তাকে চাইবে না—তবু আমি চাইব—কেন চাইব, জানিনা।

—সে কে ঝরণা?

—সে তুমি। শুনলে? রাজি হবে?

—এতো আমার পরম সৌভাগ্য ঝরণা—কিন্তু আমি অন্ধ।

—হোক—আমার চোখ আছে। তুমি তাই দিয়ে দেখবে। এসো।

বলে ঝরণা সেই প্রজাপতিটা ধরে অনিমেষের কপালে এনে বসিয়ে দিল—বললো,

—এই প্রজাপতি সাক্ষী—তোমার আমার বিয়ে হোল।

অনিমেষের অন্ধ চোখ দিয়ে জল গড়াল। ঝরণা দেখে বলল,

—কাঁদছো কেন?

—এ আমার আনন্দাশ্রু – কিন্তু ঝরণা এ কি সত্যি হবে?

—হোলই তো! বিশ্বাস হচ্ছে না?

—না—প্রবীর তোমাকে নেবে। তুমিই তো বলেছ?

—আমি না গেলে কি করে নেবে। আমি তো তার বাঁদী নই।

—কিন্তু অধিকারী মশাই হয়তো তাই করবেন।

—পারবেন না। আমি কিছুতেই রাজি হব না। তুমি দেখে নিও।

ডাক পড়লো—সাজঘরে যেতে হবে। সন্ধ্যার পরেই যাত্রা আরম্ভ হবে। ঝরণা হাত ধরে নিয়ে চললো অনিমেষকে।

যেতে যেতে অনিমেষ বললো,

—তোমাকে না পেলে প্রবীর নাকি দল ছেড়ে চলে যাবে।

—যাবে তো আমার কি? যাবে।

—রমেশবাবু খুব দুঃখিত হবেন—চটে যাবেন। তুমি প্রবীরকে বিয়ে কর ঝরণা।

—না—বিয়ে আমার হয়েছে। আর একথা নয়। এসো।

ঝরণা অতি নিকট হয়ে এলো অনিমেষের—চুমা খেল ওর।

। বার ।

উৎসাহিত জনতার অভিনন্দন ধন্য অভিনয় শেষ হোল। প্রবীরের অভিনয় অত্যন্ত ভাল হয়েছে—তাই ওখানকার সকলে তাকে সোনার মেডেল দিলেন। ঝরণাও তার ভাল নাচগানের জন্য মেডেল পেল আর পেল মীরা তার রাণীর অভিনয়ের জন্য। নাটকটা যে এতখানা সাফল্যমণ্ডিত হবে তা কেউ ভাবেনি। অনিমেষ নাট্যকার—সে অবশ্য মেডেল পায়নি কিন্তু লেখক বলে সুপরিচিত হয়ে উঠলো—তার সম্মান আবার মেডেলেরও বেশী। অনেকেই যেচে এসে দেখা করলেন এই অন্ধ লেখকের সঙ্গে।

নাম বেড়ে গেল দলের। সকলের মুখেই এই দলের নাম—"নির্ঝর নাট্য বীথি" অসাধারণ ভাল যাত্রা করে। অত ভাল শোনা যায় না।" অধিকারী রমেশবাবুই একটা নতুন প্রোগ্রাম ছাপিয়ে নিলেন ওখানকার একটা ছাপাখানায়। লেখালেন—নির্ঝর নাট্যবীথির শ্রেষ্ঠ অবদান অন্ধ অনিমেষের অবিস্মরণীয় নাট্যগীতি—স্বপ্নবাস্তব। বিলি করলেন সেটার কয়েক শত। পরদিনই ছড়িয়ে পড়ল নাম—ময়দানে টিকিট বিক্রী করে ঐ গান হবে—মূল্য যথাক্রমে দুই—পাঁচ—দশ টাকা, এটা রমেশবাবুর নিজস্ব পরিকল্পনা। একটা প্যাণ্ডেল ময়দানে করিয়ে নিয়ে তিনি টিকিট বিক্রী আরম্ভ করলেন—সেল হোতে লাগল। এসব যায়গায় দু'-পাঁচ টাকার জন্য আটকায় না কারো। সব টিকিটই বিক্রী হয়ে গেল। যথাদিনে অভিনয় হোল—উৎসাহিত রমেশবাবু এইভাবে কয়েক যায়গাতেই অভিনয় করালেন। যথেষ্ট রোজগার হোল—এ ছাড়া যেখানে যেখানে বায়না ধরা আছে সেখানে তো হলোই। প্রায় মাস ছয়েক এইভাবে দল নিয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। হাজারীবাগে এসে দল আড্ডা নিয়েছে। তিনদিন অভিনয় হবে।

যশ—অর্থ দুইই আসছে। যায়গাটার স্বাস্থ্য ভাল—জল হাওয়ার গুণে এবং মনোরম পরিবেশে সকলেই বেশ খুশী মনে আছে। অধিকারী বললেন,

—গয়ায় এ বছর যাওয়া হোল না।

—গেলেই তো হয়। জবাবটা দিল হারাণবাবু।

—না—কোন বায়না নেই।

—আমরা নিজেরাই টিকিট বিক্রী করে যাত্রা করবো।

—স্থানীয় লোকের সাহায্য না পেলে সেটা করা সম্ভব নয়।

—সাহায্য পাওয়া যাবে না কেন? বলেন তো আমি গিয়ে চেষ্টা করি।

—তা যাও—আমরা আরো দুদিন এখানেই থাকি।

—তাই হোক। হারাণবাবু গয়ায় গিয়ে ব্যবস্থা করে এলেন এবং দলকে নিয়ে গেলেন। এখানে এসে অনিমেষ শুনলে—এই গয়ায় ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব দিব্যানুভূতি লাভ করেন—ভগবান বুদ্ধ এখানেই বোধিলাভ করেন। এই পবিত্রভূমিতেই গয়াসুরের মস্তকে ভগবানের পাদস্পর্শ আছে।

চোখে যে দেখে না, তার কাছে শোনার মূল্য যে কতখানি তা সেই জানে—যে অন্ধ। অনিমেষ দু'কর্ণ দিয়ে শোনে আর হজম করে। আগের নাটকটার অসাধারণ সাফল্য ওকে উৎসাহিত করেছে—তাই পরবর্ত্তী নাটকের জন্য একটা তাগিদ সে অনুভব করে মনের মধ্যে। ভগবান শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনী সে ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে। কীর্ত্তন আর বাউল গানের মাধ্যমে—সে ভালভাবেই জেনেছে এই অবতার জীবনের মাধুর্য্যমালার ইতিকথা। তার মনে হোল—শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে অনেক কথা অনেক রকমে বলা হলেও এখনো বহু কথা বলবার আছে। এই দিব্য জীবনকে সে একটা নতুন রূপে উপস্থাপিত করতে পারে জনসমাজে।

ঝরণাকে বললো সে তার পরিকল্পনা। শোনামাত্রই ঝরণা পরম উৎসাহিত হয়ে উঠলো। বললো,

—এই শ্রীগয়াধাম থেকেই আরম্ভ করা হোক।

—আচ্ছা—আরম্ভ কর। আগে বিষয়বস্তুটা ঠিক করে নিই।

—ও—ঠিক আছে। আমরা শ্রীগয়াধামে তাঁর আসার আগের অবস্থা থেকে আরম্ভ করবো—শেষ করবো কোথায়?

—পুরুষোত্তমের মন্দিরে।

—না—নীল সিন্ধু জলে।

ঝরণার মতটাই মেনে নিল অনিমেষ। রচনা চলতে লাগলো অত্যন্ত গোপনে। অবশ্য সবাই জানে অনিমেষের গান ইত্যাদি ঝরণাই লিখে দেয়। হয়তো তার পার্ট লিখে দিচ্ছে—কেউ কিছু বলে না। প্রবীর দেখে—বলে না কিছু। ঝরণাকে পাবার কথা সে ত্যাগ করেছে। দুঃখে ম্রিয়মান হয়ে আছে প্রবীর। অভিনয়ে তার প্রচুর সুনাম এবং অর্থও সে ভাল রোজগার করছে এখন। কিন্তু অন্ধ অনিমেষ লেখে নাটক—এত ভাল নাটক—এ যেন এক পরম বিস্ময়। তাই সে ঝরণার আশা ছেড়েই দিয়েছে। তবে আক্রোশ একটা রয়েছে তাদের দু'জনেরই উপর। কিন্তু কি করবার আছে। ঝরণা যাকে ইচ্ছে বিয়ে করবে। না করলেও কারো কিছু বলার নেই।

গয়ার কাজ শেষ করে যাত্রাদলকে কলকাতার ফিরিয়ে আনলেন রমেশবাবু, আবার নতুন একটা পালা ধরতে হবে। এবার একজন নতুন নাট্যকারকে ধরবেন তিনি, কিন্তু ঝরণা জানালো—অনিমেষ নাটক লিখছে।

—শোনাও তার নাটক।

নাটক লেখা এখনো শেষ হয়নি। তাই দিন সাত সময় চাইল ঝরণা। এই সাতদিন দু'জনে প্রায় সমস্তক্ষণ একত্রে থাকে। এই

সান্নিধ্য নারী ও পুরুষের মধ্যে এমন একটা সম্বন্ধ বাঁধে যা অচ্ছেদ্য। অন্ধ অনিমেষ আর রূপসী ঝরণার এই সম্বন্ধ স্থাপিত হোল।

নাটক শেষ হোল। অধিকারী রমেশবাবু এবং আরো সকলে শুনলেন, ঝরণা পড়ে গেল। আবেগমাখা কণ্ঠস্বরে পাঠ করলো সে নাটকটি। শ্রীবিন্দুপ্রিয়ার প্রেমাস্বাদনে কেমন করে প্রেমিকা-শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধায় রূপান্তরিত হোল পণ্ডিতপ্রবর নিমাইএর জীবন—কেমন করে পুরুষদেহ এক দেহাতীত নারীস্বত্ত্বায় রূপান্তরিত হয়ে বলতে পারলো—শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেন মে"—তারই আশ্চর্য্য সুন্দর প্রকাশ হয়েছে এই নাটকে। ছন্দে—গানে—কথায় এবং কাজে এ যেন এক স্বর্গলোকের মর্ত্ত্যপ্রকাশ! নিমাই-চরিতের অমিয় নির্ঝর যেন প্লাবিত করে চলেছে শ্রীভগবান—সাগরের নীল জলে মিলিত হবার আকুল বেদনায়। শুনে সকলে স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। অশ্রু প্রায় সকলের চোখে।

অধিকারী রমেশবাবু একটু সামলে অনিমেষকে বুকে নিয়ে বললেন,

—তোমার প্রতিভা বিশ্বখ্যাতি লাভ করুক।

অনিমেষ প্রণাম করলো তাঁকে। রমেশবাবু আবার বললেন,

—তোমাকে যেদিন এনেছিলাম—তোমার গান শুনেই এনেছিলাম। আজ তুমি যা দিলে তার মূল্য নেই—সে অমূল্য। যাক্—কাকে কি পার্ট দেওয়া হবে?

—আপনারাই ঠিক করবেন।

প্রবীরও শুনছিল। কেউ কিছু বলবার পূর্ব্বেই সে দুঃখের সুরে বললো,—এতে আমার কোনো পার্ট নেই।

—সেকি! কেন?

—নিমাইএর কণ্ঠে গান আছে—আমি তো গাইতে পারিনে। ওটা অনিই করবে।

কথাটা সত্যি। সিনেমা হলে অন্যের গান চালানো যেতো।

প্রবীরকে কিন্তু ছাড়া যায় না—অথচ সবাই জানে, নায়ক বা উপনায়ক না হলে ও পার্ট নেবে না। অধিকারী রমেশবাবু অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

অনিমেষ ধীরে ধীরে বললো,

—প্রবীরদাই নিমাই হবেন। গানগুলো আমি বাউল বেশে গেয়ে দেব। তার জন্য যেটুকু বদল করা দরকার তা করে নেওয়া হোক।

—না—প্রবীর তীব্র প্রতিবাদ করলো—তাতে নাটকটা ক্ষুণ্ণ হবে। তার কোনো দরকার নেই। তুমিই নিমাই সাজ—আমাকে বাদ দাও।

কথাটা কারো ভাল লাগলো না। প্রবীর চটেছে। বর্ত্তমানে সে খুব নামকরা অভিনেতা। অন্য যাত্রাদলে বা থিয়েটারে চলে যেতে পারে। সিনেমায় যাওয়াও অসম্ভব নয়। কারণ প্রবীর যথেষ্ট শিক্ষিত এবং সুঅভিনেতা। তবু কিছুই করবার নেই। প্রবীর বলল,

—এই নাটকে আমাকে বাদ দেওয়া হোক। আমি দিনকতক বিশ্রাম নিতে চাই।

—কোথাও চেঞ্জে যাবে?

—হ্যাঁ—ইলোরা—অজন্তা দেখবার একটা সুযোগ পাচ্ছি—যাব। যদি পারি তো বোম্বাই—পুণা ইত্যাদি হয়ে দক্ষিণ ভারত দেখে আসবো।

—তা ভাল কথা—তবে দল ছেড়ে যাবে না তো?

—না না—দল ছাড়ার কথা কেন ওঠে?

আর কেউ কিছু বললো না। পরদিন সন্ধ্যায় প্রবীর বললো ঝরণাকে,

—আমি যাচ্ছি ঝরণা।

—এসো।

—না, আর আসবো না। আশীর্ব্বাদ করি—তুমি সুখী হও।

—এ যে কচ ও দেবযানীর মত কাব্য শোনাচ্ছ প্রবীরদা !

—হ্যাঁ—ঝরণা, কাব্যই জীবনের বহমান স্রোত। নইলে জল-স্রোতহীন হয়ে বন্ধ হয়ে যায়—সে জলে দুর্গন্ধ হয়।

—বড় বড় পুকুরে—হ্রদে তা হয় না প্রবীরদা

—আমি বড় পুকুর নই ঝরণা, নিতান্ত ডোবা—যাক—চল্লাম।

চলে গেল প্রবীর। ঝরণা দেখলো—বুঝলো, প্রবীর সত্যি আর আসবে না। দুঃখবোধ যে হচ্ছে না তা নয়—কিন্তু উপায় কি। অন্ধ হলেও অনিমেষকে সে ভালবাসে। তাকে অসহায় ফেলে প্রবীর বা অন্য কাউকে বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব নয়—তাই চুপ করে রইল ঝরণা। অধিকারী রমেশবাবু বললেন—প্রবীর ঝরণাকে না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে চলে গেল। তাকে আর ফেরানো যাবে না। ঝরণাকে তিনি কোনো রকমেই রাজী করাতে পারেননি প্রবীরকে বিয়ে করতে। দলের খুবই ক্ষতি হবে—তবে মাধব আছে তাকে নিয়েই কাজ এখন চালাতে হবে। তারই ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

নতুন নাটকের মহড়া চলছে। অন্ধ হলেও অনিমেষের চোখ যে অন্ধ তা বাইরে থেকে বোঝা যায় না, তাই অভিনয়ে কোনো ক্ষুণ্ণতা হয় না। ঝরণা এমন সুন্দর করে ওর অভিনয়ের স্থান এবং দরকারি জিনিষ গুছিয়ে দেয় যে ধরাই যায় না—সে অন্ধ।

ড্রেস রিহার্সেল হোল—অনিমেষের অভিনয় মুগ্ধ করলো সকলকে কিন্তু ততোধিক মুগ্ধ করলো স্বামী বিরহক্ষিন্না বিষ্ণুপ্রিয়াবেশিনী ঝরণার অভিনয়। সে যেন এক আশ্চর্য্য প্রেমের মূর্ত্ত প্রতীক।

উড়িষ্যায় পুরীধামে প্রথম অভিনয় হবে—দল চললো সেখানে! রথযাত্রায় লোকারণ্য পুরীধাম—টিকিট কিনে যাত্রা শুনতে হবে—প্রতিদিন সীট ভর্ত্তি হয়ে যায়—বহু দর্শনার্থী টিকেট না পেয়ে ফিরে যান। আশ্চর্য্য সুনাম হয়েছে পালাটার। নাট্যকার অনিমেষকে দিন শতাধিক লোক দেখতে আসে।

॥ তের ॥

প্রবীর চলে যাওয়ায় দলের ক্ষতি হবার কথা। কিন্তু অধিনায়ক রমেশবাবু অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি—তিনি মাধবকে তো আগেই তালিম দিয়ে রেখেছেন—অন্য একজন নতুন অভিনেতাকেও সংগ্রহ করলেন। তার নাম বিজয় মিত্র। পল্লীর ছেলে—গাঁয়ের যাত্রাদলে অভিনয় করতো। তার অভিনয় একদিন দেখে এলেন রমেশবাবু। দেখে বুঝলেন, ভাল শিক্ষা পেলে এই যুবক খুব ভাল অভিনেতা হবে। অতি অল্প বেতনে তিনি নিযুক্ত করলেন বিজয়কে নিজের দলে।

চেহারা ভাল—কণ্ঠস্বর জোরালো এবং অভিনয়ের উপযোগী। তাকে ট্রেনিং দিতে আরম্ভ করলেন হারাণবাবু এবং রমেশবাবু নিজে। মাস-খানেক শিক্ষা দিয়েই তাকে অনিমেষের নতুন নাটকটায় রাজার ভূমিকায় নামিয়ে দিলেন একটা আসরে। বিজয় ভালই অভিনয় করলো। অবশ্য অনিমেষের অভিনয়ে যে প্রাণ—যে দরদ—যে স্বপ্নালু মাধুর্য্য তা অবশ্য বিজয় দিতে পারলো না, তবে রাজার আভিজাত্য মর্য্যাদা ভালই ফোটালো। চলে যাবে ওকে এই অভিনয়ে, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ নাটকে নিমাইএর ভূমিকায় ওকে নামানো চলে না। গান বিজয় গাইতে পারে না—ওটা অনিমেষই করবে।

পর পর দু'খানা নাটক লিখে সফল হওয়ায় অনিমেষের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। সে লিখতে পারবে আরো ভাল লিখবে। কিন্তু অধিকারী রমেশবাবু বললেন একটা সামাজিক বা ঐতিহাসিক নাটক ধরা হবে। অনিমেষ যদি পারে তো লিখুক।

অসুবিধা আছে অনিমেষের। সমাজ সম্বন্ধে তার জ্ঞান নিতান্তই অপ্রতুল—চোখে সে কিছুই দেখে না—সমাজের কতটুকুই বা সে জানে।

ইতিহাস না পড়লে ঐতিহাসিক নাটক লেখা যায় না। পৌরানিক নাটকের সুবিধা এই যে—ওতে কল্পনার অবাধ বিস্তার চলে এবং পাত্র-পাত্রীকে মনের মত করে গড়ে তোলা যায়। গল্পটা মাত্র অবলম্বন—কিন্তু তার নাটকীয় প্রকাশভঙ্গী নাট্যকারের নিজস্ব। তাই অনিমেষ সবিনয়ে বললো যে এটা সে পারবে না।

ওর অসুবিধার কথা বুঝে রমেশবাবু দলের নাট্যকারকে শুধোলেন,

—আপনি এই দু'বছরে কি লিখলেন ?

—সামাজিক একখানা লিখেছি।

—শোনান—কবে শোনাবেন ?

—কালই শুনুন।

অতঃপর নতুন নাটক শোনা হোল—মমোনয়ন হোল এবং সেইটারই মহড়া চললো। এতে অনির কোনো অংশ নেই—গল্পটা অত্যাধুনিক সমাজ নিয়ে। গান আছে মেয়েদের গলায়। পাত্র-পাত্রী-গণ হরদম বাংলা-ইংরাজি-হিন্দি ভাষার কথা বলে যা অনিমেষের পক্ষে বলা দূরে থাক বোঝাই অসম্ভব। জেলী—কীট্‌স্—বায়রণ থেকে আধুনিক যুগের ইংরেজ কবিদের কবিতার কোটেশান বিস্তর। অনির জন্য শেষ দিকে নাট্যকার একটা ভিখারীর গলায় একতারা সহযোগে গাইবার জন্য একখানা গান রচনা করে নিয়েছেন যার না আছে তাৎপর্য্য না বা মাধুর্য্য। ঝরণা বলল,

—ও গান না গাইলেও চলবে।

—হ্যাঁ—তবে করা যায় কি। অনিকে তো কোথাও ঢোকানো গেল না।

—নাইবা ঢুকলো অনিদা। ও থাক এটাতে—নতুন কিছু শিখুক বরং।

—হ্যাঁ—সে কথা ভাল !

সকলেই সমর্থন করলেন ঝরণার কথা। অনিমেষকে এই নাটকে নামতে হোল না। ঝরণা এসে বললো,

—জান অনিদা ঐ নাট্যকার তোমাকে হিংসে করে।

—কেন? ওর কি করলাম আমি?

—তুমি বিস্তর করেছ। নাটক লিখে নাম করে ওর রুটি মারছো। তোমাকে ছোট করবার জন্য ঐ ভিখারীর গানটা তোমাকে দিয়ে গাওয়াতে চায় ও।

রাগে ঝরণার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো—কিন্তু অন্ধ অনিমেষ তা দেখতে পেল না। হেসেই বললো,

—তা হোক গে! কী আর করা যাবে।

—যাবে—করা কিছু যাবে বইকি। কিছু করতে হবে। ওকে জব্দ করবো।

—ছিঃ ঝরণা—যাক্ গে। ওসব কিছু করো না। অনর্থক ঝগড়া।

—ঝগড়া করবো না আমি—আমি তোমাকে নিয়ে অন্য নাটক লেখাব।

—সামাজিক?

—না—ইতিহাস নিয়ে। তার জন্য আমি পড়ছি, এতে তুমি সামাজিক—ঐতিহাসিক—পৌরানিক সব ব্যাপারের সুবিধা পাবে—কিন্তু—

—কিন্তু কি আবার?

—প্রবীরদা থাকলে ভাল হোত। ও খুব লেখাপড়া জানা ছেলে—আর খুব খোঁজ রাখে। ইতিহাসটা যোগাড় তো করতোই—অভিনয়টাও ওকে দিয়ে করানো যেতো।

—অন্য কেউ করবে।

—প্রবীরদাকে দিয়ে করাতে পারলে ভাল হোত।

—সে আর কি হবে। তোমার জন্যই তো চলে গেল প্রবীরদা।

—তা কি করা যায়। ভাল না বেসে তো তাকে বিয়ে করতে পারিনে আমি! যাক শোন গল্পটা—লিখতে হবে।

—বল।

ঝরণা বলতে লাগলো—এই বাংলা দেশের এক খ্যাতনামা কবি নাট্যকারের গল্প। নাম তাঁর নীলকণ্ঠ—সাধক এবং সঙ্গীতকার রূপে পরিচিত তিনি—যাত্রাগান করতেন। তাঁরই জীবনালেখ্য নিয়ে তখনকার সমাজ ও সংস্কারের কথায় ভর্ত্তি এই কাহিনীটি সংগ্রহ করেছে ঝরণা। যতটা সম্ভব তাকে নাট্যরূপে চিত্রিত করেছে। নাটকীয় উপাদানও আছে—আছে তীব্র ঈশ্বরানুরাগ—সাধনোচিত চরিত্র এবং দয়া-মায়া-স্নেহমমতায় পরিপূর্ণ একটি জীবন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত এক জ্বলন্ত ঈশ্বরবিশ্বাসে পরিপূর্ণ এই কাহিনীটি শোনালো।

অনিমেষ ভাবতে লাগলো—এই গল্পে নাটক কেমন হতে পারে। নীলকণ্ঠের নাম তার শোনা আছে—দু'একটা গানও জানা আছে—কিন্তু তাঁর জীবন নিয়ে নাটক রচনা হবে কিনা কে জানে।

গল্পটিকে নানা ভাবে সাজালো অনিমেষ। হ্যাঁ—হতে পারে কিছু কল্পনার আশ্রয় অবশ্য নিতে হবেই—তা হোক—তদানীন্তন সমাজের একটি চিত্র আঁকা যেতে পারবে। এই সময়—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মর্ত্তে ছিলেন দেহধারী হয়ে—ছিলেন বিবেকানন্দ—কেশব সেন এবং আরো বহু জনগণ পূজ্য ব্যক্তি। কিন্তু অনিমেষের মন ওদিক দিয়ে গেল না—সাধক কবির সঙ্গীতের মাধ্যমে ঈশ্বর লাভের আকুতি এবং গ্রামদেশের নানা ব্যাপারের সঙ্গে—নানা সমাজের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান নিয়েই গল্পটি সাজালো। বললো ঝরণাকে। শুনে ঝরণা বললো,

—এ খুব ভাল হবে। নীলকণ্ঠের ঐ পোষ্য পুত্রটাকে অন্ধ করে দাও।

—অন্ধ ?

—হ্যাঁ—আর ওরই প্রেমে পড়ুক ঐ কলাবতী না কি নাম দিয়েছ।

—তারপর ? শেষ কি হবে ?

—নীলকণ্ঠের দেহত্যাগের পর ওরা দুজনে চলে যাবে বৃন্দাবনের পথে।

—বেশ—তাই হবে। লিখবে কখন ?

—আজ থেকেই যদি চাও তো লেখা হবে। খাতা-কলম ঠিক আছে আমার।

এরপর আর কথা কি। রচনা আরম্ভ হয়ে গেল। নীলকণ্ঠের একটি স্নেহপাত্র ঠিক করা হয়েছে যে অন্ধ। সে দলে গান করে বাঁশী বাজায়—সে যুগে নারী নিয়ে যাত্রাভিনয় অচল ছিল। ছেলেকেই মেয়ে সাজিয়ে অভিনয় করানো হোত। এ যুগে তা আর নেই ঝরণার কথামত একটি মেয়েকে আনা হয়েছে নাটকে—নাম কলাবতী সে এক দরিদ্রের কন্যা—গান গেয়ে ভিক্ষা করে। মাঝে মাঝে আনা হয় নীলকণ্ঠের দলে গাইতে। এই কলাবতীকেও নীলকণ্ঠ কন্যাস্নেহে গান শেখান। ঐ সূত্রে পরিচয় নায়ক বিমলের সঙ্গে তার।

হঠাৎ অনিমেষ বললো,

—শুনে সকলেই বলবে, এদের সব নাটকেই একটা অন্ধ থাকে।

—তা বলুক—অন্ধ তো আছেই এই দলে !

—সব নাটকেই ?

—না—সব কেন হবে ? তোমার লেখা নাটকে।

—কিন্তু নাইবা ওকে অন্ধ করলাম ?

—কর। করতে হবে। অন্ধের জন্য মানুষের একটা দরদী প্রাণ আছে।

অনিমেষ আর কিছু প্রতিবাদ করলো না। অন্ধ নায়ককে নিজের সকল অনুভূতি নিয়ে সে সাজালো ! তার দেখবার আগ্রহ কতখানা—

তার জানবার—বুঝবার ব্যাকুলতা কী নিদারুণ, আর তার জন্য অন্ধের মানসিক যন্ত্রণা কী অসহ্য তা সে ব্যক্ত করলো এই নাটকে।

শুনে ঝরণা বললো,

—চমৎকার! এ অভিনয় তুমি ছাড়া কেউ করতে পারবে না।

নাটকটা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেললো ওরা দুজনে। অধিকারী রমেশবাবু এবং আর সকলে শুনে বললেন,

—নাটক ভাল হয়েছে। তবে এ বছর এটা থাক।

—না—ঝরণা বললো—এটা তাহলে অন্য দলে দেওয়া হোক।

—অন্য দলে অভিনেতা কোথায়? ঐ অন্ধের ভূমিকায় কে নামতে পারবে?

—কথাটা সত্যি। ঝরণা থেমে গেল। কিন্তু অনিমেষ বললো,

—দুটো নাটকই তো চলতে পারে।

—পারে—তবে—আচ্ছা ভেবে দেখি—

রমেশবাবু তখনকার মত কথাটা চাপা দিলেন কারণ দুটো নাটকের শুধু মহড়া দেওয়াই নয়—সাজসরঞ্জামও চাই এবং সেকালের অনেক আসবাবও চাই। তাছাড়া নীলকণ্ঠের ভূমিকায় নামবার মত লোক দেলে নেই। নাটকটা নিতে অসুবিধা ঘটছে। ঝরণা বললো,

—থাক তা হলে।

কিন্তু সে যে খুব দুঃখিত হয়েছে—তা বোঝা গেল। রমেশবাবু বললেন,

—আসছে বছর এটা করা হবে। অত দুঃখের কি আছে?

ঝরণা কথা কইল না। চটেছে—বোঝা গেল। ঝরণা যে অনিমেষের প্রতি অনুরাগিনী তা সকলের জানা। তাই রমেশবাবু হেসে বললেন,

—তোদের বিয়েটা না হয় তার আগেই সেরে দেব।

—যাঃ! আমি তাই বলছি নাকি? নাটকটা যদি পছন্দ হয়ে

থাকে তো অবিলম্বে করা দরকার। নইলে গল্পটা কেউ মেরে দিতে পারে।

—হ্যাঁ—তবে ও তো আমাদের বাক্সে থাকবে।

—কত লোক তো শুনলো—কে জানে কার মনে আছে।

কথাটা সত্যি। গল্পটা শুনেছে দলের নাট্যকার এবং সবাই জানে যে তাঁর এরকম অভ্যাস আছে। রমেশবাবু নাটকটার মহড়া দেবেন—ঠিক করলেন।

॥ চোদ্দ ॥

"নীলকণ্ঠ" নাটকেরও মহড়া আরম্ভ হোল। দলের প্রবীণ নাট্যকার বরেনবাবু সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্যকার—প্রবীণ এবং পারদর্শী। এই দলেই তার চারখানা নাটক চলছে। সহরের অন্যান্য দলে আরো খানপাঁচেক। নাটক লিখে তিনি বাড়ী-গাড়ীও করেছেন। এমন একজন লোকের উপর টেক্কা দিয়ে ঝরণা ঐ অঙ্কটার রচনা চালাবে এবং বরেনবাবুর থেকে বেশী নাম করে যাবে এটা তাঁর সহ্য করা কঠিন। তিনি ঠিক জানেন—ঝরণার সাহায্য ছাড়া অনিমেষের পক্ষে কিছু লেখা অসম্ভব। ঝরণাই এর মূলে। এটা বরেনবাবু অসম্মানজনক মনে করছেন—কারণ অনিমেষের নাটকটা খুবই ভলে বলছে সকলে। রাগ তাঁর আরো চড়ে গেল। ঝরণাকে জব্দ করবার উপায় ভাবতে লাগলেন। মিলেও গেল একটা পথ।

বরেনবাবুর একখানা নাটক বোম্বাইএর এক চিত্রনির্ম্মাতা কিনেছেন। তাঁরা ছায়াছবি তৈরী করবেন। ঐ নাটকে একজন নৃত্যশিল্পীর দরকার। তারাই বরেনবাবুকে লিখেছেন যদি কোনো ভাল নৃত্যশিল্পী থাকে তো যেন যোগাড় করে দেওয়া হয়। উপযুক্ত দক্ষিণা দেওয়া হবে। বরেনবাবু অধিকারীকে বললেন,

—ঝরণাকে মাসখানেকের জন্য দিন—বোম্বাইএর কাজটা করিয়ে আনি।

—তা কি করে হবে? এখানে আমাদের কাজ তাতে আটকায়।

—না—এখন তো দলের রিহার্সেল চলছে। আমি ওকে মাসখানেকের মধ্যেই ফিরিয়ে আনবো। দল বাইরে বেরিয়ে যাবার আগেই ওকে ফিরে পাবেন। তাছাড়া ঝরণার ভবিষ্যৎ রয়েছে। যদি

ওখানে নাম করতে পারে তো মোটা টাকা পাবে। ওকে আটকে রাখবেন না।

রমেশবাবু আমতা আমতা করতে লাগলেন। কিন্তু সম্মানিত নাট্যকার বরেনবাবুর অনুরোধও এড়াতে পারলেন না। অবশেষে ঝরণাকে ডাকা হোল।

—বোম্বাই যেতে তোমার মত আছে ঝরণা?

—আজ্ঞে না—আমি যাব না।

—আহাম্মক মেয়ে তুমি—বরেনবাবু সস্নেহে বললেন,

—শোন, যাবে আমার সঙ্গে—মাসখানেকের মধ্যেই আমার সঙ্গে ফিরে আসবে। যদি নাম করতে পার তো আখেরে জীবনটা ধন্য হয়ে যাবে। এ চান্স ছেড়ো না।

—আমার যাবার ইচ্ছে নেই—ঝরণা বললো—আমি বেশ আছি।

—বেশ নেই। তোমার যা পার্টস্ আছে তাকে ফুটে ওঠার যোগ্য সুযোগ করে দিতে চাই আমরা—চল—অমত করো না—বুঝলে!

—আমি ভেবে বলবো—

বলে ঝরণা তখনকার মত কথাটা কাটিয়ে দিল। কিন্তু বরেনবাবু আবার বললেন,

—তোমার ভালর জন্যই এতটা করছি আমরা। মাত্র মাসখানেকের জন্য চল।

—দেখি—

বলে ঝরণা চলে এল।

নিশ্চয়ই ভাবনার কথা। না—বোম্বাই—দিল্লী—কোথাও যাবে না ঝরণা।

অনিমেষকে ছেড়ে কোথাও তার যাবার ইচ্ছে নেই। কথাটা বললো অনিমেষকে।

—তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্যই ওঁরা চেষ্টা করছেন ঝরণা।

—কে জানে—তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার ইচ্ছে নেই।

—মাত্র মাসখানেক তো! দেখেই এসো না একাবার।

—তুমিও বলছো?

—হ্যাঁ—যদি ভাল না লাগে চলে আসবে।

—কে জানে—আমার কিন্তু ভাল লাগছে না—

ঝরণার মন যে বোম্বাই যেতে রাজি নয় তা বুঝলো অনিমেষ! কিন্তু ঝরণার ভবিষ্যৎ আছে। নাম-যশ হলে অর্থেরও প্রাচুর্য্য হবে। ঝরণা জীবনটা সুখে কাটাতে পারবে। অন্ধ অনিমেষের জন্য তার এখানে পড়ে থাকার কোনো যুক্তি নেই। অনিমেষ তাই আবার বললো,

—যাও—চিঠি লিখবে আমায়—যদি ভাল না লাগে, চলে আসবে।

পরদিন বরেনবাবু আবার কথা তুললেন এবং অধিকারী রমেশ-বাবুর সম্মতি নিয়ে ঝরণাকে বোম্বাই নিয়ে যাবার জন্য প্লেনে টিকিট করলেন। যাবার সময় অনিমেষের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে ঝরণা কেঁদে ফেলল,

—তোমাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে অনিদা—

—না—না—ছেড়ে কেন? আবার আসবে—আবার দেখা হবে।

—না যদি দেখা হয় তাহলে—

—সেকি?—না হবে কেন? নিশ্চয় হবে।

ঝরণাকে নিয়ে বোম্বাই এলেন রবেনবাবু। ঝরণা যে খুব উচ্চ-শ্রেণীর নৃত্যশিল্পী তা নয়—তবে সুন্দরী—নবযৌবনা কুমারী মেয়ে—বাঙ্গালী তরুণীর যে একটা অসামান্য লাবণ্য থাকে এই বয়সে—ঝরণারও আছে—খুব বেশী মাত্রায় আছে। নাচ যেমনই হোক—তাকে পছন্দ

হয়ে গেল ওদের—পারিশ্রমিক ঠিক হোল—ঝরণা কাজে যোগ দিল। প্রথম ক'দিন খুব অস্বস্তি লেগেছিল তার—কিন্তু সয়ে গেল। খাতির খুব—আদর-সম্মানের আতিশয্য—প্রীতিভোজের নিমন্ত্রণ—পরস্পরের মধ্যে আলাপ—বন্ধুত্ব—ইত্যাদির সঙ্গে বেড়ানো ইত্যাদিতে খানিকটা শান্ত হোল ঝরণার মন। কাজ সে ভালই করছে। কয়েক দিনের মধ্যেই আরো দুটো পার্টির সঙ্গে কনট্রাক্ট করিয়ে দিলেন তার বরেনবাবু। দু'একটা জলসায় ওকে নামিয়ে নামটা কাগজে বিজ্ঞাপিত করে চালিয়ে দিলেন ঝরণাকে এক অসাধারণ নৃত্যপটিয়সী নারীর সম্মানে। নাম-যশ এবং অর্থও আসছে। ঝরণা এখন সুপরিচিতা নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী। এত তাড়াতাড়ি নাম-যশ হয় না—কিন্তু ওকে বুম করা হয়েছে। তাই এটা হোল। এছাড়া তার ভাগ্য—তাই হোল।

এখানে এসে গোড়ার দিকে ঝরণা দু'খানা চিঠি সপ্তাহে লিখেছে অনিমেষকে। কিন্তু অন্ধ অনিমেষের পক্ষে তার সবকটার জবাব দেওয়া সম্ভব নয়—অন্ধ সে, নিজে পড়া এবং জবাব লেখার উপায় নেই। অপরের ভরসা করতে হয়—তাই অনির উত্তরের সংখ্যা কম—ইচ্ছা থাকলেও পারে না। তাছাড়া ঝরণা চলে যাওয়ায় তার মনের অবস্থা এমন যে কিছুই যেন ভাল লাগে না। নাটক রচনার কথা তো চিন্তাই করেনা সে। বুকটা যেন ভেঙে গেছে অনির। ভেবেছিল মাস-খানেক পরেই ঝরণা ফিরবে কিন্তু তিনমাস চলে গেল ঝরণা ফিরলো না। চিঠির সংখ্যাও কমে এসেছে। এ মাসে মাত্র একটা চিঠি এসেছে ঝরণার। লিখেছে খুব ব্যস্ত আছি। আরো দুটো পার্টিতে কনট্রাক্ট করলাম—আমার ফিরতে দেরী হবে। ভালবাসা নাও।

ভালবাসা সে জানায়—এবারও জানিয়েছে—কিন্তু একি ভালবাসা! এতো শুধু মুখের কথা। তবে অনিমেষ সমস্ত দুঃখ সহ্য করে—ভাবে অন্ধ অনিমেষকে জড়িয়ে জীবনটা কেন নষ্ট করবে ঝরণা। তার বহু যোগ্যতা, বিচিত্র সম্ভাবনা—বহু প্রতিশ্রুতি। সে সফল হোক—

জীবনকে পূর্ণ করুক। অনিমেষের জন্য আত্মবিনাশের কোনো প্রয়োজন নেই।

রমেশবাবু অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ব্যক্তি। তিনি বুঝেছিলেন, বোম্বাইএ নাম করতে পারলে ঝরণা আর ফিরবে না। নাম-যশ অর্থই মানবজীবনের কাম্য। ঝরণা তা পারে—তার যোগ্যতা আছে। তাই 'রূপা' নামে আর একটি মেয়েকে তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। ঝরণার স্থলাভিষিক্ত করবার জন্য। রূপাই এখন ঝরণার কাজ চালাচ্ছে। কিন্তু রূপার সঙ্গে অনিমেষের তেমন জমলো না। রূপা শুধু রূপসী নয়—বিদুষীও। বি-এ পাশ—বছর কুড়ি বয়স—অভিনয়ে সুদক্ষা! কলেজেই নাম করেছিল অভিনয়ে এখন তো রীতিমত অভিনেত্রী। তার আলাপের লোক দূরপ্রসারী—বন্ধুর সংখ্যা বহু শত—স্তাবকের সংখ্যাও অগণিত। সুতরাং অন্ধ এক অনিমেষ কোথায় পড়ে আছে তার খোঁজই রাখে না সে। তার মা-দিদিমা একদিন বস্তীতে বাস করতো—এখন তেতলা বাড়ী তুলেছে বরানগরে। 'রূপা' তাদের 'এ্যাসেট'—রূপাকে তারা সেইভাবেই তৈরী করিয়েছেন।

রূপা যাত্রাদলেই যে থাকবে তার কোনো কথা নেই। থিয়েটারে যাবে। সিনেমায়ও যেতে পারে—দরকার হলে দিল্লী—বোম্বাই বা বিলাত আমেরিকাও যাবে—তবে আপাততঃ বছর খানেকের জন্য এসেছে এই নির্ঝরিণী যাত্রাদলে। 'রূপা' কোনো খেয়ালই করে না অনিমেষ সম্বন্ধে। সে জানেই না যে নীলকণ্ঠ নাটকটা অনিমেষের রচনা। 'অন্ধ গায়ক অনিমেষ' আছে, ব্যস—এর বেশী কিছু জানার তার দরকার নেই।

অনিমেষও চায় না। ঝরণার চলে যাওয়ার পর তার জীবন যেন গতিহীন হয়ে পড়েছে। গভীর রাত্রে চোখে জল আসে ঝর্ণার কথা ভেবে—বালিশ ভিজে যায়।

আজকাল মাসে একখানা চিঠি আসে ঝরণার। এ মাসে তাও আসেনি। প্রায় পাঁচ বছর হোল অনিমেষ এসেছে এই দলে। তিন-খানা নাটক সে লিখেছে এর মধ্যে—কিন্তু ঝরণা যাওয়ার পর আর কিছু লেখা হয়নি।

সেদিন রমেশবাবু বললেন,

—এ বছর নতুন একখানা নাটক লেখ তুমি।

—কি করে লিখবো? ঝরণা তো ফিরলোনা।

—না—সে আর ফিরবে না। সে এখন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী—অভিনেত্রী 'ঝরণা হালদার'—কুমারী হালদার—ইত্যাদি। মোটা টাকার মালিক। কিন্তু সে এলনা বলে তুমি তোমার প্রতিভা নষ্ট করবে কেন? তুমি লেখ। লিখবার জন্য আমি লোক দেব। একজন ভাড়া করা লিখিয়ে নাও।

অনিমেষ কিছু বললো না। লিখিয়ে তো পাওয়া যাবে কিন্তু প্রেরণা যোগাবে কে! যুক্তি-পরামর্শ করবে কার সঙ্গে! কে তার গল্পের কাঠামোতে রস সঞ্চার করবে—কে করে দেবে তার চরিত্রের চিত্রায়ণ! না—নাটক আর লিখতে পারবে না অনিমেষ—এ এখন অসম্ভব।

পরদিনই রমেশবাবু একজন লেখক আনলেন যিনি অনিমেষের নাটক লিখবেন।

—কি লেখা যায়?

—দেখুন—আপনিই তো ঠিক করবেন।

—হ্যাঁ—কিন্তু কিছু ভেবে পাচ্ছিনে।

নবাগত লেখক মনীবাবু শিক্ষিত যুবক। তিনি নিজেও লেখেন। বললেন,

—ইতিহাস নিয়ে যদি লেখেন তো অশোকের আমলের কুনাল-কাঞ্চন।

—হ্যাঁ—গল্পটা আমাকে ভাল করে শোনান তো !

এই বহু প্রশস্ত এবং বহু পরিচিত গল্পকে বহু লেখক রূপদান করেছেন। তবু অনিমেষ রাজি হোল এই গল্প লিখতে। কারণ অন্ধতার দুঃখদৈন্য সে তীব্রভাবে অনুভব করে। কুনালের মনোবেদনা ভালই ফোটাতে পারবে সে। লেখা আরম্ভ হোল। মনীবাবু সত্যি সাহায্য করছেন। গল্পটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সেই সময় হঠাৎ একদিন প্রবীর এসে উপস্থিত। এসেই দলের সব খবর নিল, অনিমেষের সঙ্গে দেখা করলো,

—ঝরণা চলে গেছে প্রবীরদা !

—জানি—সে এখন খ্যাতনামা শিল্পী—খুব নাম ডাক।

—তুমি কোথায় ছিলে ?

—ওখানেই ! ঝরণার সঙ্গে দেখাও হয়। সে তোমাকে ক্রেমনি ভালবাসে। তবে সে এখন খুব উঁচু শ্রেণী বাস করছে। টাকার কুমীর হয়েছে। ওখানে বরেনবাবুই তার গার্জেন। তিনি ওকে ব্যাঙ্ক করে নিজের বেশ কিছু গুছিয়ে নিলেন। যাক—এই নাটকটা দাও।

—কি করবে ?

—বোম্বাইএর এক সিনেমা পার্টিতে বেচবো। ভাল টাকা পাবে। অবশ্য এখানে বাংলায় যাত্রা যেমন হচ্ছে হোক—কিছু ক্ষতি হবে না।

নাটকটার একখানা কপি নিয়ে চলে গেল প্রবীর।

॥ পনের ॥

সিনেমায় নাটক বিক্রীর কোনো সম্ভাবনার কথা কোনোদিন চিন্তাই করেনি অনিমেষ। কিন্তু প্রবীর তাই করলো—সত্যি সে মাসখানেক পরে হঠাৎ একদিন এসে বললো,

—অনির বইটা বিক্রী হয়েছে—সাত হাজার টাকা সে পাবে। আর যদি আপনি ওকে ছেড়ে দেন তো কুনালের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যও ওকে আমি নিয়ে যাব।

—তুমি কি ভূমিকায় নামবে?

—আমি সম্রাট অশোকের ভূমিকায় নামবো।

রমেশবাবু চিন্তা করতে লাগলেন। অনিমেষকে তিনি কুড়িয়েই এনেছেন বলা চলে। এখন সে তার নিজের গুণে এবং রমেশবাবুর প্রচারের বলে নাম যশ লাভ করেছে। অন্ধ হলেও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং প্রতিভার দীপ্তি—তার সাফল্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মত সে কেমন অনায়াসে তার কাজ করে যায়। এই প্রতিভাকে আটকে রাখা ঠিক হবে না। তিনি রাজি হলেন মাত্র একটা সর্ত্তে। বললেন,

—তোমাকে আমি মার্চ্চ থেকে আগষ্ট মাস পর্যন্ত ছেড়ে দিচ্ছি অনি—অর্থাৎ চৈত্র মাস থেকে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত। তারপর কিন্তু এসে আমার যাত্রাদলে অভিনয় করতে হবে—পারবে তো?

—আমার তো কিছু জানা নেই এ ব্যাপারে। প্রবীরদা যা বলবেন তাই হবে।

—হ্যাঁ—আপনার এ সর্ত্তে আমি রাজি।

প্রবীর কথা দিল এবং পরদিনই অনিমেষকে নিয়ে বোম্বাই চলে

গেল। সেখানে পৌঁছে সব ব্যবস্থাই করলো প্রবীর! অনি শুধালো,

—ঝরণা কোথায় আছে প্রবীরদা?

—আছে। সে এখন খুব উঁচু দরের শিল্পী—লাখপতি—কোটি-পতিরা তার নাগাল পায় না—বুঝলে। তার কথা থাক্ এখন।

অনিমেষ আর কিছু বললো না। ভাল পারিশ্রমিকেই সে নিযুক্ত হোল এবং ভালই অভিনয় করতে লাগলো। কাঞ্চনের ভূমিকায় সে যে অভিনয় করে জানেনা অনিমেষ। সে অভিনেত্রী—যথাসময়ে গাড়ীতে আসে—কাজ শেষ হলেই চলে যায়, তার খাতির এত বেশী যে স্বয়ং ডাইরেক্টারও সমীহ করে কথা বলেন তার সঙ্গে। কিন্তু অনিমেষ ভাবে—গলার স্বরটা তো ঝরণারই মত কিন্তু ঝরণা হলে অনিমেষের সঙ্গে কথা বলতো না! নিশ্চয় বলতো। তবে কথা তো হিন্দি—হয়তো ভাষান্তরিত কথার জন্য অনির বুঝতে ভুল হয়—ও নিশ্চয় ঝরণা নয়—অন্য কেউ। প্রবীরকে প্রশ্ন করলো,

—কাঞ্চনের ভূমিকায় যিনি নেমেছেন তাঁর নাম কি প্রবীরদা?

—কলাবতী!

—বাঙ্গালী মেয়ে?

—হ্যাঁ—তার আগের নাম ঝরণা!

আঁৎকে উঠলো অনিমেষ। ব্যাকুল স্বরে বললো,

—ঝরণা? কোন ঝরণা?

—তোমার সেই প্রেমিকা ঝরণা। এখানে সে সুবিখ্যাতা নৃত্যাভিনেত্রী।

—আমার সঙ্গে তো কোনো কথাই কোনো দিন বলেনি।

—বলবে না। তোমার মত এক অখ্যাত অন্ধের সঙ্গে তার পরিচয় আছে লোকে শুনলে ওর জাত যাবে—বুঝেছ? ও এখানে লক্ষপতির

জন্য। অনিমেষের বিয়ে আর আটকায় কে? ওর বাবা একটা মোটা দাঁও মারবার আশায় গ্রামদেশের সকলকে জবাব দিয়ে বললেন,

—অনির গার্জেন এখন রমেশবাবু—তিনি লক্ষপতি লোক—যা কিছু করবেন তিনিই। আমি কে! বাবা হলেও আমি গার্জেন নই। লাখ খানেক টাকার কম হবে না—বাড়ী চাই—গাড়ী চাই—গয়না চাই···

অনি বেঁচে গেল আপাততঃ। মাসখানেক সংসার আদর-যত্ন খেয়ে মলয়ের সঙ্গে নানা কথার আলোচনা করে নতুন একখানা নাটক লিখবার প্লট নিয়ে সে এসে যোগ দিল যাত্রাপার্টির সঙ্গে।

যাত্রাপার্টি রয়েছে এখন দেওঘরে। দেবস্থান—এই সময় বহু স্বার্থান্বেষী বাঙ্গালী থাকেন ওখানে। যাত্রা চললো কয়েকদিন ধরে। খুব নাম করলো ওখানে এই দল। অনির নাম তো লোকের মুখে মুখে।

কয়েকমাসই নানা যায়গায় গান করে কলকাতায় ফিরলেন রমেশবাবু। অনিমেষের নতুন নাটক লেখা হয়নি। ঝরণা তো নেই—মুনীবাবুও নেই—কে লিখবে। নাটক আর হয়তো লেখা হবে না অনিমেষের। একটা ঠিকা লোক সে রাখলো নিজেই মাইনে দিয়ে—সে অনিকে সংবাদপত্র পড়ে শোনাবে সকালে—দুপুরে শোনাবে বঙ্কিম—শরৎ—রবীন্দ্রনাথের লেখা—আর রাত্রে লিখবে অনির নাটক। মাইনে একশ' টাকা দিতে হবে। নাটকের দরুণ অনিমেষ টাকা পায়—খরচ সে করতে পারবে এখন। অপরের চোখ নিয়েও যে কতখানা উন্নতি করা সম্ভব অনিমেষ তার প্রমাণ। ঝরণাই কিন্তু এ সব করতো তার জন্য। বলতে গেলে এই ভাবে ভাষা লেখা—নাটক লেখা সবই ঝরণার দান।

'ঝরণা' কথাটা ভাবতেই কান্না পায় অনিমেষের। কলকাতার

কাগজে কাগজে শোনে কলাবতীর আশ্চর্য্য সুন্দর অভিনয় আর নৃত্যের গুণগান। সে নাকি এ বছর নৃত্যশিল্পীর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করবে। সম্মান আরো বেড়ে গেল ঝরণার। ভাল! খুবই ভাল! ঝরণার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হোক—অনিমেষ প্রার্থনা করে।

নতুন এই নাটকটায় কোনো অন্ধের ভূমিকা নেই। ইচ্ছে করেই অনিমেষ বাদ দিয়েছে অন্ধ চরিত্র। তার বদলে আছে একজন অসহায় বিকলাঙ্গ' যুবক যে ধনী সমাজে প্রতিপত্তিশালী হয়েও শারিরীক অক্ষমতার জন্য সুন্দরী পত্নীর মন পায় না। সামাজিক এই নাটকে ঐ যুবকটির জীবনের নির্ম্মম—নিষ্ঠুর পরিণতি ফুটিয়ে তুলেছে অনিমেষ নিপুণতার সঙ্গে। অসাধারণ দক্ষতায় সে নিজে এই যুবকের অভিনয়ে রূপদান করলো। সহরের সকলেই বললো—অনিমেষ আশ্চর্য্য শক্তিশালী অভিনেতা।

অনিমেষ এখন ভাল রোজগার করে। তার কাছে বসে সাহিত্য শোনাবার জন্য সে একজন বিদূষী তরুণীকে নিযুক্ত করলো—নাম তার ইলারাণী। অতীত থেকে বর্ত্তমানের নানা লেখকের লেখা—নানাভাষার গল্পের বাংলা অনুবাদ এবং বিজ্ঞান-ইতিহাস-ভূগোলের কিছু কিছু শোনায় সে। নিয়মিত রেডিও শুনেও অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে অনিমেষ। লেখাকে সে আরো ভাল করে তৈরী করতে লাগলো। ইচ্ছে তার নাট্য-সাহিত্যে কিছু নতুন অবদান সে যোগাবে। এ্যাব্‌সার্ট ড্রামারও অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করে অনিমেষ। দু'একজন খ্যাতনামা নাট্যসমালোচকের সঙ্গে আলাপও করে, সবই করায় ঐ ইলারাণী।

পঁচিশ বছরের মেয়ে ইলা কুমারী—সুন্দরী কি না জানেনা অনি—চোখে দেখেনি—তবে গলা তার মিষ্ট—ব্যবহার মধুর—চরিত্র স্নেহপ্রবণ। অনেকেই মনে করে ইলা তার পত্নী—কেউ কেউ বলেও সে কথা।

—আমার আর থাকা চলে না—ইলা সেদিন বললো।

—সেকি? কেন?

—লোকে ভাবে—আমি আপনার—

—বৌ?

—না—তাহলে তো ভাববার কিছু ছিল না। তারা ভাবে আমি উপপত্নী।

—ও—অনিমেষ চুপ করে রইল। ইলাই বললো,

—আমি কাল থেকে আসবো না—আপনি অন্য লোক দেখবেন।

অনিমেষ অন্ধকার দেখলো চারিদিক। ভেবে শুধুলো,

—কি হলে আপনি থাকতে পারেন?

—আপনার বৌ হতে পারলে থাকতাম।

—আমি অন্ধ।

—তা হোক। তবু আমি রাজি ছিলাম—এখনো আছি।

—আপনার বাড়ীর মতামত?

—দরকার নেই।

—সে কি?

—আমার মতই বাড়ীর মত।

—এটা আপনি কি বলছেন?

—ঠিক বলছি। আমি কুমারী—সাবালিকা—আত্মপ্রতিষ্ঠ।

—আপনি সব—আপনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তথাপি অভিভাবকের মৌখিক মতামতটার প্রয়োজন আছে বৈকি!

—আপনি রাজী কিনা তাই বলুন।

—রাজি। তবে বাবা আছেন—ঘরে মা আছেন—তাঁদের বলা দরকার।

—বেশ। বলুন তাঁদের। কি বলেন শুনুন। তারপর পাকাপাকি হবে।

—সেও তো সময় সাপেক্ষ।

—তাতে কি? আমি ঠিক আছি—থাকবোও ঠিক। এরপর আর কিছু ওজর আছে কি আপনার?

—না।

—তবে শুনে রাখুন—এ সংসারে আপন বলতে কেউ নাই। যারা ছিল তারা আমায় ছেড়ে চলে গেছে। তাই আপনাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিলাম—তা বোধ হয় হলো না।

অনিমেষ চুপ করে রইলো। ইলা একটু থেমে বললে,

—যাচ্ছি—আমি কাল থেকে আসবো না—নমস্কার।

চলে গেল ইলা—অনিমেষ বসে রইলো অনেকক্ষণ।

॥ ষোল ॥

প্রবীর বোম্বাইএ সিনেমায় আছে। অভিনেতা হিসাবে ভালই নাম করেছে। কিন্তু কোনো আনন্দ নাই তার জীবনে। ঝরণাকে সে পেল না। ঝরণা যে কার হবে, কেউ জানে না। সে এখন খুবই খ্যাতি অর্জন করেছে। তার নাগাল পাওয়া দুঃসাধ্য। নাগাল পাওয়ার জন্যই প্রবীর 'কুনাল আর কাঞ্চন'—বইটার নায়িকা হিসাবে ঝরণাকেই নামিয়েছিল এবং অনিমেষকে এনেছিল কুনালের ভূমিকার জন্য। সে ভেবেছিল—ঝরণা অন্ততঃ অনিমেষের পানে চাইবে। কিন্তু দেখা গেল তার ইচ্ছা পূর্ণ হোলনা।

ঝরণা কারো দিকে চাইল না—কাজ সেরে চলে গেল। এটা প্রবীর আশা করেনি। অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছে সে। ঝরণাকে পাবার আশা সে আর করে না—কিন্তু কেমন যেন একটা আক্রোশ জেগে ওঠে তার উপর। ঠিক রাগ নয়—বিদ্বেষও নয়—একটা অভিমান ক্ষুব্ধ মন যা ঝরণাকে কিছু শিক্ষা দিতে চায়। কিন্তু কি ভাবে! অনিমেষকে বোম্বাইএ এনে প্রবীর ভেবেছিল—পূর্ব্ব প্রণয়ের সূত্র ধরে ঝরণা হয়তো অনিমেষকে ভালবাসবে—কিন্তু দেখা গেল, ঝরণা গ্রাহ্য করলোনা অনিমেষকে। কথাই কইল না কোনো দিন।

প্রবীর এখন সুপরিচিত অভিনেতা। দু' তিনখানা ছবিতে সে কাজ করছে—একখানা মোটরগাড়ী কিনেছে—নিজেই চালায় এবং অবসর সময় বেড়িয়ে বেড়ায়। পড়াশুনায় তার ঝোঁক ছিল—এখন নেই। একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। দেশে আপনার বলতে তার কেউ নেই। ছিল এক মাসী যে তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিল। মাসী দেহ রাখার পর প্রবীর একেবারে আত্মীয় শূন্য একা। বিয়ে

করে একটা পরিবার সে গড়ে তুলতে পারতো—ঝরণাকে না পাওয়ায় তা সেটা আর হোল না। দু' একবার ভাবে—ঝরণাকে টেক্কা দিয়ে সে কোনো একটা ভাল অভিনেত্রীকে বিয়ে করবে। আছেও অনেক—কিন্তু না—আর কারো সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবার ইচ্ছে নেই।

প্রবীর অন্যমনস্ক ভাবে অলস মন্থর গতিতে গাড়ী চালাচ্ছে আর ভাবছে। বোম্বাই সহরের বাইরে এসে পড়েছে অনেকটা দূরে। ফিরতে হবে—গাড়ীর গতি বাড়ালো—বেগে চালালো গাড়ী!

অসতর্ক নয় প্রবীর—সাবধানেই গাড়ী সে চালাচ্ছে। কিন্তু শীতের কুয়াসাচ্ছন্ন পথ—ওদিক থেকে মোড়ের মাথায় একখানা লরীর সঙ্গে মুখোমুখী ধাক্কা। প্রবীরের গাড়ীখানা দুমড়ে ছিটকে গিয়ে পড়লো পথের পাশে নর্দ্দমায়। আরোহী প্রবীরের কোনো সাড়া শব্দ নেই। নিশ্চয় অজ্ঞান হয়ে গেছে। লোকজন জমা হোল—বের করলো প্রবীরকে গাড়ী থেকে। এখনো বেঁচে আছে হয়ত। নিয়ে গেল ওকে হাসপাতালে।

তিনদিন পর জ্ঞান হোল প্রবীরের। ডাক্তার প্রশ্ন করলেন,..

—আপনার আত্মীয়স্বজন কে কোথায় আছেন? কাকে খবর দেব?

—বাঁচবো কি?

—বাঁচা মরার কথা তো কেউ বলতে পারে না। চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

—যদি না বাঁচি—শুনুন—কলকাতায় গরাণহাটায় আমার আত্মীয় নির্ঝরিণী নাট্যবীথির মালিক শ্রীরমেশ অধিকারীর দলে আমার বন্ধু অনিমেষ ঘোষাল আছে। সে অন্ধ—আমার চোখ দুটি তাকে দান করতে চাই। অনুগ্রহ করে এই ব্যবস্থা করবেন।

—নিশ্চয় করা হবে—আর কিছু?

—না—অনিমেষকে বলবেন—সে যেন আমার চোখ দিয়ে ঝরণাকে দেখে।

বলতে বলতে প্রবীর অজ্ঞান হয়ে গেল। তার সে জ্ঞান আর ফিরলো না। ডাক্তার তার শেষ ইচ্ছামত সব ব্যবস্থাই করলেন। চোখ দুটি তুলে নেওয়া হোল চক্ষুরোগের বিশেষ চিকিৎসক দ্বারা এবং কলকাতায় খবরও পাঠান হোল। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রমেশবাবু অনিমেষকে নিয়ে এসে পড়লেন প্লেনে। অনিমেষের চোখে প্রবীরের চোখ লাগানো হবে। অনিমেষকে ভর্তি করা হোল হাসপাতালে। বিজ্ঞানের এক বিচিত্র বিস্ময়কর অবদান। একজনের চোখ অন্য এক জনের চোখে লাগিয়ে অন্ধকে দৃষ্টিদান করা হচ্ছে—একথা ভাবতেও আনন্দ জাগে। মাসখানেকও হয়ত লাগবে না—অনিমেষ দেখতে পাবে। দেখবে সে পৃথিবীকে। অন্তরের আনন্দ গোপন রাখতে পারে না সে।

আনন্দে-আবেগে ক্ষতি হতে পারে ভেবে প্রবীরের কথা জানানো হয়নি অনিমেষকে। শুধু বলা হয়েছে কোনো দাতা তাকে নিজের চোখ দান করেছেন—অনিমেষ চক্ষুষ্মান হবে। কে এই দাতা—ভাবে অনিমেষ বিছানায় শুয়ে শুয়ে।

হ্যাঁ—অনিমেষ সত্যি দেখতে পাচ্ছে আজ। দেখছে সুন্দর শ্যামল ঘাস—ফুল—লতা—পাতা—ডাক্তার—নার্স এবং রমেশবাবুকে। সম্পূর্ণ সুস্থ এবং দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন এখন অনিমেষ। কিন্তু এতদিনে ওকে জানানো হোল প্রবীরের শেষ কথা এবং তার অনুরোধ। 'ঝরণাকে তার চোখ দিয়ে যেন দেখে অনিমেষ।' কোথায় ঝরণা! সে তো আসেনি। কোনো খবরই জানে না। কে জানে কোথায় আছে। অনিমেষ ভাবছে প্রবীর কত বড়—কত উদার—কত মহান!

খবর নিয়ে অনিমেষ জানলো—চিত্রাভিনেত্রী কলাবতী বিশ্বচলচ্চিত্র উৎসবে যোগদানের জন্য বিলাত গেছে কয়েকমাস আগে। কখন

ফিরবে জানা নেই। সে য়ুরোপ ঘুরছে। প্রবীরের শেষ অনুরোধ রাখা হোল না—ক্ষুণ্ণমনে অনিমেষ কলকাতায় ফিরলো। এবার সে একবার বাড়ী যাবে—দেখবে তার দেশ—গ্রাম—মা—সৎমা এবং মলয়কে। মলয় অবশ্য খবর পেয়ে কলকাতাতেই দেখা করলো—এবং সঙ্গে নিয়ে এল অনিমেষকে বাড়ী। বিস্মিত গ্রামবাসী দেখলো অনিমেষ এক অপরূপ সুন্দর যুবক হয়ে ফিরেছে। তার চোখদুটি সব থেকে সুন্দর—পদ্মপলাশবৎ। পৃথিবীর সঙ্গে নব পরিচয় ঘটছে অনিমেষের। এ যে কী আনন্দ তা ভাষায় বলা যায় না—তবু তার অন্তর ব্যথিত থাকে প্রবীরের শেষ কথা রাখনা হয়নি। উপায় কি? ঝরণা এখন বিশ্বখ্যাতা অভিনেত্রী—তার নাগাল পাওয়া অসম্ভব।

ইলা চলে যাওয়ার পর আর কোনো নাটকই লেখা হয়নি। জয়দেবের মেলায় গিয়ে অনিমেষ সাধক বিল্বমঙ্গলের সাধনপাঠ দেখে এল। অন্ধ বিল্বমঙ্গলের জীবন মহাকবি গিরীশচন্দ্রের নাটকে জীবন্ত হয়ে ফুটেছে। তবু অনির মনে হোল—এই আখ্যায়িকায় সে কিছু নব অবদান যোগাতে পারবে। কলকাতায় এসে লিখতে আরম্ভ করলো একজন লিখিয়ে নিয়ে। বিল্বমঙ্গল শুধু দৃষ্টিতেই অন্ধ নন—সাধন-অন্ধও। তাঁর অন্ধ বিশ্বাস কী জ্বলন্ত ভগবৎ প্রেমানুভূতিতে পূর্ণ হয়েছে সেই কথাই নাটকে লিখলো সে। নাটকটা সত্যি ভাল হোল। অভিনয় হবে নির্ঝরিণী যাত্রাদলে। নির্ঝরিণী যাত্রা দলে নূতন নূতন নাটকের অভিনয় হয়—তাই খুব নামকরা দল হয়ে পড়েছে। ওদের দক্ষিণা কিছু বেশী—তবু নানা স্থান থেকে ডাক আসে। এবারও এল—বহু দূর দূর থেকে ডাক এল। যথাকালে রমেশবাবু দল নিয়ে বেরুলেন—সঙ্গে অনিমেষ। সে এবার বিল্বমঙ্গলের অভিনয় করবে। চক্ষুরত্ন লাভ করেছে—সেই চোখকে নিজের হাতে অন্ধ করে এই চরিত্রের অভিনয় করতে হবে। অনিমেষ এখন অসাধারণ দক্ষতার

সঙ্গে করলো—এমন আশ্চর্য্য সুন্দর জ্বলন্ত ঈশ্বরপ্রেম সে ফুটিয়ে তুললো যা দেখে পাষণ্ডরাও ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

গিরীশবাবু লিখেছেন থিয়েটারের নাটক অনিমেষ লিখেছে যাত্রার জন্য। গল্পেও অনেক অদলবদল করেছে অনিমেষ—যে সব নতুন তথ্য এ সম্বন্ধে বের করেছেন পণ্ডিতমণ্ডলী সেভলেণ্ড দিয়েছে অনিমেষ তার নাটকে। বহু চরিত্রের বিচিত্র সমাবেশে সাধকশ্রেষ্ঠ বিল্বমঙ্গলের জীবন কথার এ এক অপরূপ রূপায়ণ। নাটকটা অসামান্য খ্যাতি অর্জন করলো।

অনিমেষের এই নাটক বেতারে প্রচার হোল। দেশবাসী শুনে সত্যি প্রশংসা করলেন। আবার শুনতে চাইলেন তাঁরা!

অনিমেষের নাটকগুলো ছাপা হচ্ছে। বহু সৌখীন যাত্রাসম্প্রদায় অভিনয় করছে তার নাটকের। নাম-যশ বাড়ছে অনিমেষের। অর্থও কম আসছে না। রমেশবাবু তার জন্য একখানা বাড়ী কিনে দিলেন—একখানা গাড়ীও। অনিমেষ এখন সম্পন্ন ব্যক্তি। তার ঘরের সামনে সে প্রবীরের একটা মর্ম্মর মূর্ত্তি গড়িয়ে স্থাপন করেছে। নিত্য সেই মূর্ত্তিতে নিজের হাতে মালা দেয় অনিমেষ। বলে,—"বহু ভাগ্যে তোমাকে পেয়েছিলাম—বন্ধু যেখানেই থাক, আমার অন্তরের ভালবাসা গ্রহণ করে।"

একটা বকুলগাছ থেকে ফুল ঝরে ঝরে পড়ে ঐ মূর্ত্তিতে। অনিমেষ বিছানা থেকেই দেখে প্রতি প্রভাতে সেই মূর্ত্তি।

নাট্যকার অনিমেষ শুধু নাট্যকারই নয়—সঙ্গীতেও সে অসাধারণ। বহু রেকর্ড হয়েছে তার গানের বহু গুণীজন তা শোনে। ভালই বিক্রী হয়। নানা ভাবে অর্থ তার আসছে। তবু মন তার বড়ই একাকীত্ব অনুভব করে। একা সে—নিদারুণ একা। অনেকই বলে 'বিয়ে করুন'। অনিমেষ মলিন হেসে বলে—'না।'

প্রবীরের শেষ ইচ্ছা পূরণ করা হয়নি। অনিমেষের মনে সব সময়

এই ক্ষোভ জেগে আছে। হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে দেখলে, চিত্রাভিনেত্রী কলাবতী এ বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসাবে রাষ্ট্রিয় সম্মান লাভ করবে। অনিমেষ কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠলো—সেই ঝরণা—যে অনুক্ষণ তার পাশে পাশে থাকতো। যার প্রেরণায় অনিমেষ আজ নাট্যকার—সম্পন্ন ব্যক্তি। নাম-অর্থ সবই করেছে। সেই ঝরণাকে চক্ষুষ্মান সে একদিন দেখবে না? সেখতেই হবে। অনিমেষ জানে ঝরণাই কলাবতী নামে পরিচিতা। জানে তার বোম্বাইএর ঠিকানাও। একখানা চিঠি সে লিখলো ঝরণাকে—শুধুমাত্র আবেদন করে—যেন ঝরণা এক মিনিটের জন্যও তার সঙ্গে দেখা করে। ঝরণার সম্মতি পেলে অনিমেষই বোম্বাই গিয়ে দেখা করবে তার সঙ্গে।

কলাবতীর হয়তো এমন শত শত চিঠি আসে—সেই ভিড়ে অনিমেষের চিঠি হারিয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় অনিমেষ রেজিষ্টারী করে পাঠাল চিঠিখানা। আশা করছে ঝরণা নিশ্চয় সম্মতি দেবে এবং অনিমেষ বোম্বাই গিয়ে দেখা করবে তার সঙ্গে। কিন্তু কৈ? কোনো জবাব তো এল না। অভিমানে দুঃখে ক্ষোভে অনিমেষ অত্যন্ত ম্রিয়মান হয়ে পড়লো।

॥ সতের ॥

উৎসব শেষ হলে কলাবতী য়ুরোপ ভ্রমণ করছে—মাস তিনচার ঘুরলো, দেখলো নানা দেশ—সেখানকার উচ্চ শ্রেণীর কলানৈপুণ্য—সর্ব্বত্র সম্মানিতা এই ভারতীয় অভিনেত্রী জীবনে যা স্বপ্ন দেখেনি, তাই পেল। বাল্যজীবনের "কুড়ুনী" প্রথম জীবনের 'ঝরণা' সে নাই আর; এখন সে বিশ্বখ্যাতা কলাবতী। জেট্ প্লেনে একদিন দেশে ফিরলো কলাবতী – অভ্যর্থিত হোল বোম্বের সকল শিল্পীমণ্ডলীর দ্বারা। তাকে ঘিরে দিন কয়েক চললো উৎসব। স্তাবকের গুঞ্জন—প্রডিউসারের ভিড় এবং শিল্পীদের সহমর্মিতা ওকে অন্য কিছু ভাববার অবকাশই দেয় না।

পত্রাদি আসে—ওর সেক্রেটারী প্রয়োজনীয়গুলি ওর কাছে আনে, পড়ে শোনায়—জবাবও দেয়। কলাবতীর নিজের এ সব করবার সময় নেই। হঠাৎ সেদিন এল একখানা রেজিষ্টারী। সহি করে নিল সেক্রেটারী—চিঠিটা খুললো না। কলাবতী বাড়ী ছিল না, একটা নতুন ছবিতে কাজ করবার জন্য অজন্তায় গেছে। ফিরতে প্রায় দিন পনর দেরী হোল। এরমধ্যে পত্রের স্তূপ জমে উঠেছে। ফিরলে সেক্রেটারী সব পত্রই আনলো এবং পৌঁছে বেছে দরকারীগুলোই দেখালো। রেজিষ্টারী চিঠিও দেখালো সে। কলাবতী বললো,

—দেখি ঐ চিঠিখানা।

নিজে পড়ে দেখলো—অনিমেষ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করছে একবার দেখা করবার জন্য। খুবই সংক্ষিপ্ত চিঠি—তবু তার আবেদন মর্ম্মস্পর্শী। কলাবতী কি ভাবলো—সেক্রেটারীকে বলল,

—এর জবাবটা আমিই লিখে দেব।

চিঠিখানা নিজের হ্যাণ্ডব্যাগে রাখলো সে। কিন্তু অজস্র স্তাবকের ভিড়—অসংখ্য রকমের কথাবার্ত্তা—উন্নত শিল্পের জন্য নিজের প্রস্তুতি ইত্যাদি ব্যাপারে জবাব আর দেওয়া হোল না। হ্যাণ্ডব্যাগেই রয়ে গেল চিঠিখানা।

অনিমেষ নামে একজন তার জীবনে এসেছিল, একথা চেষ্টা করেই স্মরণ করতে হয়—সে চেষ্টা এখন আর কেন করবে কলাবতী। কোনো প্রয়োজন তো নেই। অতীত জীবনের কথা কে আর ক'বার স্মরণ করে! বোম্বাই সহরের খ্যাতনামা নৃত্যাভিনেত্রীর যশ—অর্থ—সম্মান আজ আকাশস্পর্শী - অনিমেষকে সেখান থেকে দেখা যায় না আদৌ।

অন্ধ অনিমেষের চক্ষুলাভের কথা কিন্তু জানে না কলাবতী হয়তো কোনো দিনই জানবে না—কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। নিমন্ত্রণ পেল কলকাতা থেকে—একটা ছবিতে ভাল অভিনয় করবার জন্য কলাবতী পুরস্কার পাবে।

হিন্দীভাষায় চিত্রিত এই ছবিখানি সর্ব্বত্র সম্মানিত ও জনপ্রিয় হয়েছে—তাই এখানকার চিত্রামোদীরা এই পুরস্কার দেবেন। বাংলার এই অভিনেত্রী এখন দেশের গৌরব। কলাবতী কলকাতায় আসবার জন্য প্রস্তুত হোল। সঙ্গে তার সেক্রেটারী এবং ঐ চিত্রের আরো অনেকে। কলকাতায় পৌছাল। অভ্যর্থনা—অভিনন্দন ইত্যাদির ভিড়ে দু'চার দিন তো অবসরই মিললো না বাইরের কোনো খোঁজখবর নেবার—হঠাৎ সেদিন সকালে মনে পড়ল—পুরানো দিনের রমেশবাবুর কথা—নির্ঝরিণী নাট্যবীথির কথা—প্রবীরের কথা এবং অন্ধ অনিমেষের কথাও।

কলকাতায় তার আগমন সংবাদ সাড়ম্বরে কাগজে মুদ্রিত হয়েছে। রমেশবাবু নিশ্চয় জানেন সেকথা—এবং অন্য সকলেই জানে। আজ তার মনে পড়ে গেল অনিমেষের সেই চিঠিখানার কথাও। উত্তর তো

দেওয়া হয়নি। আছে হয়তো তার হ্যাণ্ডব্যাগে। খুঁজে বার করলো কলাবতী চিঠিখানা—পড়লো—তারপর কি জানি কি ভেবে একখানা ট্যাক্সি ডেকে রওনা হয়ে গেল অনিমেষের বাড়ীর ঠিকানায়।

তখন খুব সকাল—এত ভোরে লোকজনের ভিড় কম—তাই খুব দ্রুতই এসে পৌঁছাল কলাবতী। ছোট্ট একখানা বাড়ী কিন্তু সামনের উঠোনটা বেশ বড়। তার মাঝে একটা বকুলগাছের নীচে বাঁধানো বেদীতে কে একজন বসে রয়েছে। ট্যাক্সি থেকে নেমে কাছে' আসছে কলাবতী—বসে থাকা লোকটি পিছন ফিরে মালা গাঁথছিল—কলাবতী এসে দাঁড়ালো। তাকে সে দেখেনি।

হাতের গাঁথা মালা মূর্ত্তির গলায় পরিয়ে দিল—দেখলো কলাবতী মূর্ত্তিটি প্রবীরের—লোকটি কে! ফিরে দাঁড়াতেই কলাবতী চিনলো অনিমেষ। সে কিছু বলবার পূর্ব্বেই অনি শুধোলো,

—কে আপনি! কোত্থেকে এসেছেন?

—আমি - কলাবতী সামলে গেল। অনিমেষ পুনরায় শুধোলো,

—আমার কাছেই কি এসেছেন?

- হ্যাঁ -

হাতজোড় করে আবেদন করলো অনিমেষ। কলাবতী দেখলো অনিমেষের আরও সুন্দর চোখ - কিন্তু সে কি দেখতে পাচ্ছে! হ্যাঁ - কলাকে অভ্যর্থনা করে সে নিয়ে এল বেদীতে। বসালো -

—আপনার কি প্রয়োজনে আমি লাগাতে পারি?

—বলছি - আপনি কি দেখতে পান এখন?

—হ্যাঁ -

—চিনতে পারছেন না আমায়?

—না - কখনো তো আপনাকে দেখেছি বলে মনে হয় না? তবে গলার স্বরে মনে হচ্ছে···

—কি মনে হচ্ছে?

—আপনি—কলাবতী দেবী !

—আমি ঝরণা – সেই ঝরণা তোমার ।

আনন্দে আবেগে কণ্ঠ রোধ হয়ে এল অনিমেষের । ঝরণা বলল,

—তোমার চোখ ফিরে পাওয়ার খবর তো চিঠিতে লেখনি – আমি জানতাম না –

—শোন – প্রবীরদা তার চোখ আমাকে দান করে বলে গেছে তার চোখ দিয়ে আমি যেন তোমাকে দেখি – এই তার শেষ অনুরোধ ।

– দেখ – দেখ অনিদা –

বলতে বলতে অশ্রুরুদ্ধ ঝরণা প্রবীরের মূর্ত্তির গলা থেকে মালাটি নিয়ে অনিমেষের কণ্ঠে পড়িয়ে দিল – বলল,

– আমি জানতাম না, প্রবীরদার প্রেম কত মহৎ সে কত বড় ছিল !

– সে আকাশের মত উদার – এসো আমরা ওকে অন্তরের ভালবাসা জানাই ।

বকুলগাছটার ডালে একটা কোকিল ডাকছে কুহু – কু···

॥ শেষ ॥